Vol. 50 | No. 2-3 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবুল মনসুর আহমদের ভাষাচিন্তা ও সাহিত্যাদর্শ

Volume	50
Issue	2-3
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো. চেঙ্গীশ খান
Published online	June 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v50i2-3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i2-3.8
Pages	১২১-১৪৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আবুল মনসুর আহমদের ভাষাচিন্তা ও সাহিত্যাদর্শ

Check for updates

মো. চেঙ্গীশ খান*

ভূমিকা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারা এক ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তিনি ধর্মের সীমা অতিক্রম করে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের থেকে এবং বাঙালিত্বের সীমা অতিক্রম করে পশ্চিম-বাংলা থেকে যেমন স্বতন্ত্র হিসেবে দেখেছিলেন, তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকেও তিনি সম্পূর্ণ বাংলাদেশি হিসেবে রূপান্তর করতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে-নিবন্ধে, ভাষণ-বক্তৃতায় ও আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে তাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যের কথা জানা যায়। মোটামুটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের নিজস্বতায় রূপান্তর করতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপকে হিন্দুয়ানি বা পশ্চিমবঙ্গীয় আখ্যা দিয়ে তাকে মুসলমানি বা পূর্ববঙ্গীয় হিসেবে নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি সফলকাম হতে পারেননি বা বাংলাদেশের কোনো কবি-সাহিত্যিক-চিন্তাবিদ তাঁর এই আদর্শকে গ্রহণ করেননি। এজন্য তিনি তাঁদের কঠোর সমালোচনাও করেছেন। তিনি অখণ্ড বাংলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে দেখাতে চেয়েছেন যে, দুই বাংলার সংস্কৃতি কখনো অভিন্ন ছিল না এবং সে জন্যে ১৯৪৭ সনে বাংলা ভাগ হওয়ার পর সংস্কৃতিগত ভিন্নতার কারণে উভয় অঞ্চলের ভাষা-সাহিত্যও অভিন্ন হতে পারে না। তাঁর মতে — "১৯৪৭ সালের বাটোয়ারায় বাংলার 'আমিত্ব' পড়িয়াছে তৎকালীন পূর্ব-বাংলায়, আজিকার বাংলাদেশে। ঐ সংগে বাংলার জাতীয় আত্মাও আসিয়াছে এখানেই। আজিকার বাংলাদেশই তাই সমগ্র বাংলা।" (মনসুর, ১৯৯৫ : ১৫৪) বিভাগ-পূর্ব বাংলার রাজধানী কলকাতা হওয়ায় ও কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটায় স্বভাবতই তার নেতৃত্বে ছিল হিন্দুরা এবং সে অঞ্চলের ভাষাই হয়েছিল সাহিত্যের ভাষা, আর সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের জীবনাচরণ অর্থাৎ 'হিন্দুয়ানি সাহিত্য'। কিন্তু দেশ-বিভাগের পরে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা হওয়ায় এবং ভাষা-সংস্কৃতির দিক থেকে বাংলাদেশ পূর্ব থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় লেখক প্রচলিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পশ্চিমবঙ্গীয় আখ্যা দিয়ে তাকে আর গ্রহণ করতে চাননি। আর সে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন পূর্ববঙ্গীয় ভাষা ও সাহিত্যকে — যা কখনো বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের অনুমোদন বা সমর্থন লাভ করেনি। এই প্রবন্ধে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আবুল মনসুর আহমদের বাংলাভাষা-চিন্তার স্বাতন্ত্র্য, তাঁর সাহিত্যাদর্শ এবং এসব বিষয়ে প্রাজ্ঞজনের অভিমত আলোচিত হয়েছে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

এক

আবুল মনসুর আহমদের ভাষাচিন্তা ও সাহিত্যাদর্শ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী এবং তাকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বলা যায় না। তবে এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাভাবনা শুধু একজন বাঙালি মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়ায় তা কিছুটা প্রশ্নসাপেক্ষ। বাংলা সাহিত্যের আদি, মধ্য ও আধুনিক যুগের পূর্বাপর ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, সব যুগেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র ধারা বিদ্যমান ছিল এবং পূর্ববাংলা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশই প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী। 'ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা' প্রবন্ধে তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন — "খৃষ্টীয় সনের তের শতকের আগেতক বাংলাদেশ বংগ, পুণ্ড্র ও বংগাল এই তিনটি জনপদে বিভক্ত ছিল। পরে এই তিনটি জনপদ মোটামুটি পশ্চিম বংগ, উত্তর বংগ ও পূর্ব বংগ নামে পরিচিত হয়। এই তিনটি জনপদ আবার ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতে মাত্র দুইটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আজিকার পূর্ব-বাংলা, মানে তৎকালীন পুণ্ড্র-বংগাল, ছিল বংগ এলাকা। আজিকার পশ্চিম বাংলা, মানে তৎকালীন বংগ, ছিল অবংগ বা অংগ এলাকা।" (মনসুর, ১৯৯৫ : ৭৩) এই পৃথক দুই সাংস্কৃতিক অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছিল বিশুদ্ধ সংস্কৃতের আওতাভুক্ত এবং আবুল মনসুর আহমদের বিবেচনায় পূর্ববঙ্গের ভাষা ছিল বৌদ্ধ-সংস্কৃত — যার সমর্থন কোনো বাঙালি বিদ্বান করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। লেখকের মতে — "এইভাবে গোটা বাংলাদেশ তৎকালে দুইটা স্বতন্ত্র ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। গুপ্ত পাল বংশের সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত উত্তর-ভারতসহ রাঢ়-উৎকল অঞ্চলের উন্নত রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্যের ভাষারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পক্ষান্তরে গৌড়রাজ শশাংক গোপাল ও তাঁদের পরবর্তী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বৌদ্ধ ধর্মের খাতিরে পাটলিপুত্রের বৌদ্ধ সম্রাটদের পরোক্ষ অনুমোদনক্রমে পুণ্ড্র-বংগালে বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করে। পরে সেন বংশের অভ্যুত্থানে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলে। তাতে বৌদ্ধ ধর্মের পতন ঘটে। বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষাও বিপদের সম্মুখীন হয়।" (মনসুর, ১৯৯৫ : ৭৪) পাল আমলে বৌদ্ধদের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গোড়াপত্তন হলেও সেন আমলে তার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে সেন রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ চর্চা হয়েছিল এবং সেন রাজাগণ ভিনদেশীয় ও ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী হওয়ায় বাংলা ভাষার প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। (অসিত, ১৯৯৪ : ৬)। মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন — "তারা (সেনরাজারা) শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী ছিলেন। সেজন্যে বাংলা তাঁদের সংস্কৃতি ও চর্চার ভাষা ছিল না। দেবভাষা সংস্কৃতের মাধ্যমে তাঁরা রাজকার্য নির্বাহ করতেন। সংস্কৃত কবি জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার কবি ছিলেন। সেন আমলে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনর্জাগরণের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়।" (হাই, ১৯৮০ : ২৯) আর আবুল মনসুর আহমদ এই বিষয়টির ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে বলেছেন যে, পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভাষাতেই চর্যাপদ রচিত হয়েছিল এবং হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সেনযুগে এসে এই ভাষাকে উৎখাত করে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা চালুর চেষ্টা

করলেও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর মুসলিম শাসকেরা নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে জনগণের নিকট পরিচিত ও প্রিয় করার জন্য এবং জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার উপায় হিসেবে প্রচলিত ভাষাকেই সমর্থন দিয়েছিল ও সাহিত্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। লেখকের মতে —

> আমার প্রতিপাদ্য এই যে সাহিত্যিক বাংলা ভাষার জন্ম দেন গৌড়কেন্দ্রিক পূর্ববাংলা। বৌদ্ধ যুগের মাগধ-প্রাকৃত-দেশজ মিশ্রিত বৌদ্ধ সংস্কৃতই বাংলা ভাষার জননী। গৌড়রাজ মুসলিম সুলতানরা, আরাকানের রাজারা এবং তাদের অনুগত হিন্দু রাজা মহারাজারাই সে সন্তানের পালক পিতা। এই পালন ও পৃষ্ঠপোষকতা চলে একটানা তিনশ' বছরেরও বেশি। এই যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপ ও আংগিকে মুসলিম-প্রভাবিত একটা পূর্ব-বাংগালিত্ব ছিল। পূর্ব বাংলায় হিন্দু কৃষ্টির মধ্যেও এই যুগে একটা বৌদ্ধ উদারতা ইসলামী সাম্য ও বারেন্দ্র আভিজাত্য ছিল। এই যুগের বাংলা সাহিত্যে ছিল তা প্রকট। পক্ষান্তরে বর্তমানের পশ্চিম বাংলায় এই যুগে কোন বাংলা ভাষাই ছিল না, সাহিত্য ত দূরের কথা। আসলে ঐ যুগের পশ্চিম বংগবাসী জাতিতে বাংগালী ছিল না। বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও রাজধানী পাটলিপুত্রের নিকটতম দেশের অধিবাসী হিসেবে পশ্চিম বাংগালীরা এই সময় ছিল জাতিতে ভারতীয়। ফলে এই যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোন উৎকলী বা রাঢ়ীয় রূপ ছিল না। একমাত্র বারেন্দ্র রূপই ছিল তার পরিচয়। চণ্ডিদাস কাশীরাম কবীন্দ্র পরমেশ্বর কৃত্তিবাস মালাধর বসু শ্রীকর নন্দী কবিকঙ্কন বিজয়গুপ্ত ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বহু হিন্দু মনীষী, মুহাম্মদ সগীর দৌলত কাজী আলাওল বাহরাম খাঁ সাইফুল্লা সৈয়দ সুলতান সৈয়দ হামযা ও গরীবুল্লাহ প্রমুখ শত শত মুসলিম মনীষী বাংলা সাহিত্যের সেবা করেন এই রূপেই। (মনসুর, ১৯৯৫ : ৭৫)

যে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বাঙালিকে 'পক্ষীজাতি' হিসেবে ও তাদের ভাষাকে 'পাখির ভাষা' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, যে বঙ্গ ছিল আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত (নীলিমা, ১৯৭৮ : ৪৬৯), যে বঙ্গে পদার্পণ করলে আর্যদের জাত যেত ও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কপালে 'ব্রাত্য' কলঙ্কতিলক (অর্থাৎ একঘরে) এঁকে দেওয়া হত — সে বঙ্গ মূলত পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ (অসিত, ১৯৯৪ : ২)। কালক্রমে আর্যরা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলা ভাষার প্রতি তাদের উত্তরসূরিরা একই মনোভাব পোষণ করতে থাকেন। মধ্যযুগে এসেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষাকেই অনেকটা আঁকড়ে থাকেন এবং বাংলা ভাষায় রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে অনুবাদকারীদের রৌরব নরকে যাওয়ার অভিশাপ দেন।[১] (দীনেশ, ১৯৭১ : ৯)। এ-সময় "হিন্দু-সমাজ শাস্ত্রাচারের দোহাই পেড়ে সংস্কৃত চর্চাকেই সমর্থন করত। তাছাড়া শাস্ত্রকথা বাংলায় অনুবাদ করাকে পাপকর্ম মনে করত। দেশী ভাষা চর্চার ফলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটবে — এ আশঙ্কায় তারা দেশী ভাষা চর্চার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। ফলে যে-ই তাদের বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করেছে তাকেই তারা 'সর্বনেশে' বলে গাল দিয়েছে। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস বাংলায় রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ করে 'সর্বনেশে' বলে নিন্দিত হয়েছিলেন।"[২] (সুনীল, ১৯৮০ : ২৫) মধ্যযুগের মুসলমান কবিরাও এ ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানেরা যেমন আরবি-ফারসি শব্দবহুল সাহিত্য রচনা করতে থাকেন, তেমনি হিন্দুরাও সংস্কৃত

ভাষার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। লেখকের দৃষ্টিতে, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ছিল মুসলিম শাসকদের ছায়াতলে একদিকে হিন্দু-ধর্মের প্রেমের বাণী ও ইসলাম-ধর্মের সাম্য-ভ্রাতৃত্বের বাণীর সমন্বয়ে বাংলা ভাষায় যুক্ত সাহিত্য-চর্চার ধারা এবং অন্যদিকে 'সাহিত্যের ভাষায় ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে দৃঢ়ভাবে পূর্ব-বাংলার প্রভাবের স্থলে পশ্চিম-বাংলার প্রভাব প্রবর্তনের চেষ্টা'। এই চেষ্টাকে লেখক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পাঁচশ বছরের মুসলিম প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা এবং একই সঙ্গে মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারের অপচেষ্টাও বলেছেন। এর নায়ক হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন মধ্যযুগের নবজাগরণের প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যকে (১৪৮৬-১৫৩৩)। 'চৈতন্য ভাগবৎ' গ্রন্থের একটি অংশ উদ্ধৃত করে লেখক (১৯৯৫ : ৭৬) তার মধ্যে 'পূর্ব বাংগালী বিদ্বেষ' প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।[৩] চৈতন্যবাদকে লেখক ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্ববাদের আলোকে হিন্দু-রেনেসাঁ আন্দোলন নামে অভিহিত করে এর মধ্যে পূর্ব-বাঙালি বিদ্বেষ ও মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার এবং বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতানুসারী করে তা থেকে বহুযুগের প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ বর্জনের মাধ্যমে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশের সুত্রপাত হিসেবে মনে করেছেন। (মনসুর, ১৯৯৫ : ৭৬-৭৭)।

বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ বলতে লেখক সেসব শব্দের মূল রূপকে নয়, বরং জনগণের মুখের ভাষায় প্রচলিত ঐসব শব্দের 'বাংগালী লোক্যালাইয্ড' রূপকে বুঝিয়েছেন, যা আমরা বাংলা রূপেই ব্যবহার করি। মধ্যযুগের হিন্দু ও মুসলমান উভয় কবিদের রচনায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রাচুর্য থাকলেও এবং উভয়ে যুক্ত সাহিত্যসাধনা করলেও আঠার শতকে এসে তা দুটি স্বতন্ত্র ধারায় রূপ নেয়। লেখক এর নাম দিয়েছেন 'হিন্দু ধারা' ও 'মুসলিম ধারা' এবং শব্দ ব্যবহার ও বিষয়বস্তুগত পার্থক্যের ভিত্তিতে যার নাম যথাক্রমে 'হিন্দুয়ানি বাংলা' ও 'মুসলমানি বাংলা'। "প্রকৃতপক্ষে ছ' সাতশ' বছর পাশাপাশি বাস করলেও বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য কখনো লুপ্ত হয়নি। সত্য বটে, বৈষ্ণবচিন্তায় সুফীবাদের প্রভাব রয়েছে ও মুসলমান কবিরাও বৈষ্ণব পদ লিখেছেন, বাউল চিন্তা হিন্দু-মুসলমান উভয়কে আকর্ষণ করেছিল, পীরবাদ ও গুরুবাদে সাদৃশ্য আছে, তবু জনসাধারণের চোখে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মপালন ও সামাজিক জীবনযাপনের ভিন্নতা সর্বত্রই খুব স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত।" (মনিরুজ্জামান, ১৯৮৫ : ১০)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও হিন্দু-মুসলমানের এই স্বাতন্ত্র্যের কথা স্বীকার করে বলেছেন — "একথা মানিতেই হইবে যে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৮ : ২৪৯) এছাড়াও এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন কামনা করতে গিয়ে তিনি তাদের স্বাতন্ত্র্যের প্রসঙ্গে একাধিক স্থানে বলেছেন —

> ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে– ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। একপক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বারা রুদ্ধ। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৮ : ৩৫৭)
> ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মোটা দুইভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৮ : ৩৫৯)
> ধর্ম আমাদের মেলাতে পারেনি, বরঞ্চ হাজার খানা বেড়া গড়ে তুলে সেই বাধাগুলোকে ইতিহাসের অতীত শাশ্বত বলে পাকা করে দিয়েছে। ...ধর্মমত ও সমাজরীতির সম্বন্ধে হিন্দু-

> মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, একথা মানতেই হবে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৮ : ২৬৪, ৩৬৬-৩৬৭)
>
> আর মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ। (উদ্ধৃত: মনিরুজ্জামান, ১৯৮৫ : ২৩৫)

প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের এই স্বাতন্ত্র্যবোধের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় উভয়েই স্ব-স্ব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। পার্থক্য ছিল শুধু মুসলিম-রচিত সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের প্রাচুর্য এবং হিন্দু-রচিত সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য। তবে প্রত্যেকে তাঁদের রচনায় প্রয়োজনানুযায়ী সংস্কৃত ও আরবি-ফারসি শব্দ নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন। বরং ফারসি রাজভাষা হওয়ায় ও সাহিত্য-সাধনায় মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় হিন্দু-কবিদের মধ্যে সংস্কৃতের পাশাপাশি আরবি-ফারসি শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০) রচনা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সাহিত্যে শুধু আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের জন্য নয়, বরং সাহিত্যের প্রকৃত রসাস্বাদনের উপযুক্ত যে-কোনো ভাষার যে-কোনো শব্দের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের সেই উক্তি স্মরণযোগ্য (উদ্ধৃত : এনামুল, ১৯৯৪ : ৪৭৭) —

> না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
> অতএব কহি ভাষা যাবনি মিশাল ॥
> প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
> যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য-রস লয়ে ॥

শুধু ভারতচন্দ্রই নয়, "সেকালে ঐ লোককেই শুদ্ধভাষী এবং খানদানী ভদ্রলোক বলা হতো যাঁর ভাষায় প্রচুর পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দের মিশ্রণ থাকতো"।[৪] (আবু তালিব, ১৯৭৯ : ৩)। এমনকি শাসকের আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশায় বা রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা বা চাকরির জন্য অভিজাত হিন্দুরা ফারসি ভাষা শিখতেন। তবে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে এক শ্রেণির হিন্দুর মধ্যে সংস্কৃতানুসারী মনোভাব লক্ষ করা যায় এবং তারা সব সময় বাংলা ভাষাকে আরবি-ফারসি প্রভাবমুক্ত রেখে সংস্কৃতঘেঁষা করতে চেয়েছেন। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে তাঁরা সাহিত্যে ব্যবহারের অনুপযোগী হিসেবে মনে করতেন এবং তার বিরোধিতাও করতেন। কিন্তু মুসলমান সাহিত্যিকেরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষাতেই সাহিত্যচর্চায় আগ্রহী ছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা ভাষার ওপর মুসলমানদের প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে তাই বলেছেন — "ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গভাষাকে পণ্ডিতমণ্ডলী 'দূর দূর' করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন, বঙ্গভাষা তেমনই সুধি সমাজের অপাংক্তেয় ছিল — তেমনিই ঘৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিল। ...হিন্দুর নিকট বাংলা ভাষা যেমন আপনার, মুসলমানের নিকট উহা তদপেক্ষা বেশি আপনার হইয়া পড়িল। বঙ্গভাষা অবশ্য বহু পূর্ব হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল; বুদ্ধদেবের সময়ও ইহা ছিল, আমরা ললিত বিস্তারে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যকে একরূপ মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।" (দীনেশ, ১৯৭১ :

৫-৬) এ ছাড়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়ে ব্রাহ্মণ সমাজ এদেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে বাংলা ভাষা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না। (দীনেশ, ১৯৭১ : ৫-৬) আবুল মনসুর আহমদ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে এই বিষয়টির ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। বাংলা ভাষার ওপর মুসলমানদের অবদানের কথা তুলে ধরে কীভাবে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পুনরায় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে পড়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বরূপটিই পাল্টে যায়, লেখক তার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। জনগণের মধ্যে প্রচলিত ভাষাকেই মুসলমান কবিরা সাহিত্যের ভাষায় স্থান দিয়েছিলেন। মুহম্মদ এনামুল হক বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে কীভাবে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা স্বাভাবিকভাবে খসে পড়েছিল ও সংস্কৃতচর্চা ক্রমেই শুকিয়ে আসছিল, আর তার জায়গায় আরবি-ফারসি শব্দ ঢুকে ক্রমেই দেশে একটি 'ইসলামি পরিবেশ' সক্রিয় হয়ে ক্ষীয়মাণ 'ব্রাহ্মণ্য পরিবেশ' নিষ্ক্রিয় হচ্ছিল, তার বিবরণ দিয়েছেন।(এনামুল, ১৯৯৪ : ৩০২-৩০৩) তিনি এমন মন্তব্যও করেছেন — "এমন এক ইসলামি পরিবেশপুষ্ট মুসলিম প্রভাব বাংলা-ভাষাকে সূতিকাগৃহ ত্যাগ করিতে সাহায্য করিয়া শৈশবে লালন-পালন করিয়াছে। বঙ্গে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলে, বাংলা ভাষা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের চাপে যে আঁতুর ঘরেই মারা যাইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" (এনামুল, ১৯৯৪ : ৩০৪) অর্থাৎ বাংলা ভাষার জন্মের পর থেকেই মূলত মুসলমানদের হাতেই তা লালিত-পালিত হয়ে একটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা আবার ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে চলে যায় এবং তার সংস্কৃতকরণ শুরু হয়। আর উনিশ শতক থেকেই তার বিষময় ফল ফলতে শুরু করে। (মনসুর, ১৯৯৫ : ২৩)। আবুল মনসুর আহমদের ভাষায় —

> উনিশ শতকের গোড়া হইতেই বাংলার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইংরেজরা সক্রিয় হস্তক্ষেপ শুরু করে। ...নব জাগরণে-উদ্বুদ্ধ হিন্দু সমাজের এই মুসলিম-বিদ্বেষে তারা ইন্ধন যোগায় খুব। চাকুরী-বাকুরী ও শিল্পে-বাণিজ্যে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করে। সাম্রাজ্যবাদী 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি তারা ভাষা ও সাহিত্যেও প্রয়োগ করে। হিন্দু কলেজ-সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সংগে-সংগে প্রচলিত বাংলাকে এককভাবে হিন্দু ভাষা করিবার ব্যবস্থা করে। ...একদিকে মিথ্যা ও আধা-সত্য ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া তারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, মুসলমানরা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু নারীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। অন্যদিকে তেমনি দেখায় মুসলমানরা আরবী ফারসী শব্দ ঢুকাইয়া বাংলা ভাষারও সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। বাংলা ভাষার পবিত্রতা রক্ষার জন্য এইসব আরবী-ফারসী শব্দকে বাংলা ভাষা হইতে দূর করা দরকার। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের ও হুগলির শ্রীরামপুরের ফরস্টার মার্শম্যান ও উইলিয়াম ক্যারি প্রমুখ পাদ্রী-রাজনীতিক এই বাংলা ভাষা সংস্কার আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। ...ইংরাজ পাদ্রীরা উনিশ শতকের গোড়াতে প্রথম বাংলা গদ্য প্রবর্তন করেন, এ কথার অর্থ এই যে, তারা আরবী-ফারসী শব্দ বিবর্জিত সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলা গদ্য প্রবর্তন করেন।[৫] (মনসুর, ১৯৯৫ : ৭৮)

এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক এবং তার ফলস্বরূপ মুসলমানদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় জীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়ে। দীর্ঘ

সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনের অবসানের পর বিধর্মীয় ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাভাবিক কারণেই হিন্দুরা তাদের স্বাগত জানায়, আর মুসলমানরা তার বিরোধিতা করে। ফলে ব্রিটিশ-শাসকের কাছে হিন্দুরা তাদের সহযোগী শক্তি হিসেবে ও মুসলমানরা বিরোধী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলে হিন্দুরা সরকারি আনুকূল্য লাভ করে।

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম একশ বছরে মুসলমানদের করুণ অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় উইলিয়াম হান্টারের *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস* গ্রন্থে।[৬] মুসলমানদের এই চরম দুরবস্থার মধ্যে ভাষা-সাহিত্যের চর্চা সম্ভব হলো না, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই জায়গাটি দখল করল হিন্দু-অভিজাত শ্রেণি। উপরন্তু এই সময়ে মুসলমানদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগাল ধর্মীয় নেতারা। "মূলত মধ্যযুগ থেকে উনিশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত বাংগালী সমাজে বুদ্ধিজীবি ছিল আলিম শ্রেণী।" (বোরহানউদ্দিন, ১৯৬৯ : ৬২)। আর এঁরাই ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' ঘোষণার মাধ্যমে একদিকে ইংরেজি শিক্ষাকে হারাম ও বাংলাকে হিন্দুয়ানি ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করল, অন্যদিকে মূল ইসলামে প্রত্যাবর্তনের নামে আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি মিশ্রিত বাংলা ভাষাকে বাঙালি মুসলমানের ভাষা হিসেবে অভিহিত করল। আঠার শতকের শেষে ও উনিশ শতকের প্রথমভাগে মুসলমান কবিদের দ্বারা আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি মিশ্রিত এক ধরনের বাংলা ভাষায় রচিত হলো পুঁথি সাহিত্য বা মিশ্র ভাষারীতির কাব্য — যা উচ্চতর সাহিত্যের আসরে কখনো স্থান পায়নি। আবুল মনসুর আহমদ এই পুঁথি সাহিত্যকেই বাঙালি মুসলমানের একান্ত নিজস্ব সাহিত্যিক ঐতিহ্য হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন — "বস্তুত বাংলার মুসলমানদের যেমন একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তেমনি তাদের একটা নিজস্ব সাহিত্যও আছে। সে সাহিত্যের নাম মুসলমানী বাংলা সাহিত্য বা পুঁথিসাহিত্য।" (মনসুর, ১৯৯৫ : ১০৩) এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যকে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত বাংলা সাহিত্যের ধারা থেকে সরে এসে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, যেখানে "বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের প্রাণ হবে মুসলমানের প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও হবে মুসলমানেরই মুখের ভাষা।" (মনসুর, ১৯৯৫ : ১০৩-১০৪)। তাঁর প্রত্যাশা পূরণ হলে আমরা মীর মশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ূন কবির, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ এনামুল হক, কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ মুজতবা আলী, শামসুর রাহমান, মুনীর চৌধুরীর মতো সাহিত্যিক ও সাহিত্যবোদ্ধা ব্যক্তিত্বের পদচারণা থেকে বঞ্চিত হতাম।

দুই

আবুল মনসুর আহমদের ভাষাচিন্তা ও সাহিত্যাদর্শের মূল সুরটিই নিহিত রয়েছে বাঙালি মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা সৃষ্টির প্রয়াস নিয়ে। যে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছিল মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবি-ফারসি শব্দবহুল বাংলাচর্চার মাধ্যমে, ব্রিটিশ শাসনামলে এসে সেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হাতবদল হয় খ্রিস্টান মিশনারি ও হিন্দু পণ্ডিতদের হাতে। ১৭৭৮ সনে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ *A grammer of The Bengali Language* গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড বলেছিলেন— "যাঁরা বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে আরবী-ফারসী

বিশেষ্য মিশ্রিত করে কথা বলেন তাঁরাই সবচেয়ে সুচারুভাবে বাংলা বলতে পারেন বলে স্বীকৃত"।[৭] (উদ্ধৃত : আনিসুজ্জামান, ২০০১ : ৯৪)। তার কয়েক বছর পরে ১৮০০ সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে কতিপয় বাঙালি পণ্ডিতের হাতে যে বাংলা গদ্যের জন্ম হলো, আবুল মনসুর আহমদ তার নাম দিয়েছেন 'হিন্দুয়ানি বাংলা'। তবে উইলিয়াম কেরীকে যিনি বাংলা ভাষা শিখিয়েছিলেন সেই বাঙালি পণ্ডিত রামরাম বসুর (১৭৫৭-১৮১৩) হাতে প্রথম যে গদ্যগ্রন্থ *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* (১৮০১) লিখিত হয়, তাতে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল। "ফারসি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করলেও বাংলা গদ্যে মৌলিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস এই বইটি। রামরাম বসুর রচনারীতি সাধুভাষা ঘেঁষা হলেও সংস্কৃতানুসারী ছিল না।" (হাই ও আহসান, ১৯৯৭ : ৫৫)। মূলত রামরাম বসুর সৃষ্ট ভাষা ছিল মৌখিক বুলির অনুগামী। (নূরুর রহমান, ১৯৯০ : ৪৫৭)। কিন্তু তার পরে উইলিয়াম কেরীর নির্দেশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা সংস্কৃতানুসারী বাংলা গদ্যের সৃষ্টি করলেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় — "সেকালের সমাজে ইসলামী শব্দ প্রচুর ব্যবহার হত। তারই প্রভাবে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' রামরাম এত বেশি আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন যে, এখন এ পুস্তিকা পাঠকদের নিকট অতি বিকট মনে হবে। কিন্তু কেরী সাহেব সংস্কৃত ভাষার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণের জন্য বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের অযথা প্রয়োগ পছন্দ করতেন না। বোধ হয় তারই নির্দেশে এ গ্রন্থ প্রকাশের মাত্র এক বছর পরে প্রকাশিত রামরামের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা'য় ইসলামী ভাষার বাহুল্য একেবারে কমে যায়।" (অসিত, ১৯৯৪ : ২৮৮) এ মত কতটা গ্রহণযোগ্য তা তর্কসাপেক্ষ। গোলকনাথ শর্মা (*হিতোপদেশ*, ১৮০২), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (*মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং*, ১৮০৫), চণ্ডীচরণ মুনশী (*তোতা ইতিহাস*, ১৮০৫) ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (*বত্রিশ সিংহাসন*, ১৮০২; *হিতোপদেশ*, ১৮০৮; *রাজাবলী*, ১৮০৩; *বেদান্ত চন্দ্রিকা*, ১৮১৭; *প্রবোধ চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩) প্রমুখ পণ্ডিতের হাতে যে বাংলা গদ্যের জন্ম হয়, তা হলো আরবি-ফারসি শব্দবর্জিত সংস্কৃতানুসারী বাংলা সাধুভাষা। প্রকৃতপক্ষে বিষয়ানুসারেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের গদ্যশৈলী নিজস্ব পথ নির্মাণ করে। এখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন অবান্তর। ফারসি-নবিস রামরাম বসুর প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থটি তারই অনুপম দৃষ্টান্ত। সংস্কৃত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্য সম্পর্কেও আমরা অভিন্ন মত পোষণ করি। তাঁদের গদ্যকে 'হিন্দুয়ানি' বলে নির্দেশ করা হীনমন্যতার পরিচায়ক। বাংলা গদ্যের আদর্শ রূপ নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে রামমোহন-অক্ষয়কুমার-ঈশ্বরচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র ও পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর মাধ্যমে বাংলা গদ্য একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদের মতে, দীর্ঘ ছয়শ বছর (দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী) ধরে আরবি-ফারসি বহুল বাংলা ভাষার যে রূপটি চলে আসছিল এটা তার ব্যতিক্রম। আর এই ভাষায় মধ্যে কোনো মুসলমানিত্ব না থাকায় তিনি তা বর্জনের পক্ষপাতী এবং এর পরিবর্তে তিনি আরবি-ফারসি শব্দবহুল বাংলা ভাষা তথা পুঁথি সাহিত্যের ভাষাকেই বাঙালি মুসলমানের অনুসরণীয় ভাষা হিসেবে মনে করেছেন। লেখক তাঁর একাধিক প্রবন্ধে বাংলা ভাষার বর্তমান রূপকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংস্কৃতানুসারী

হিন্দুপণ্ডিত ও ইংরেজশাসক তথা খ্রিস্টান মিশনারিদের ষড়যন্ত্রের ফল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। 'বাংলাদেশের কালচার' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন —

> নবাগত ইংরেজ শাসকরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী কূটনৈতিক তাগিদে ও দেশ শাসনের সুবিধার খাতিরে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রচলিত ভাষা-কৃষ্টি-সাহিত্যের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উস্কানি দেয়। বাংলা কৃষ্টি-সাহিত্যকে ইসলামি ছাপমুক্ত এবং বাংলা ভাষাকে আরবী ফারসী শব্দবর্জিত বিশুদ্ধ আর্যভাষা করিবার পরামর্শ দেয়। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের কন্যা সাজাইবার অলঙ্কারাদির নির্মাণ-কাজ শুরু হয় এই সময় হইতে। এ কাজ শুরু করে ইংরেজরা একাই। সরকার ও মিশনারীদের সমবেত শক্তি নিয়োজিত হয় এই শুদ্ধিকরণে। পুরা একশ বছরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় বিশ শতকের গোড়ার দিকে এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিষময় ফল ফলিতে শুরু করে। প্রচলিত বাংলা ভাষা ও হাজার বছরের কৃষ্টি-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এ্যাংলো-হিন্দু অভিযান সফল হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পিতা বাংগালী জাতির মেজরিটি মুসলমান এই অভিযানের মোকাবেলায় রুখিয়া দাঁড়ায়। ক্রমে মুসলিম-কৃষ্টির সাথে রিভাইভ্যালিস্ট হিন্দু-কৃষ্টির এবং প্রচলিত বাংলা জবানের সাথে সংস্কৃতীকৃত নব্য বংগ ভাষার সংঘাত বাধে। এই সংঘাতের শেষ পরিণাম পাকিস্তানের সৃষ্টি। (মনসুর, ১৯৯৫ : ২৩)

তাঁর মতকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত করে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি। 'ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা' প্রবন্ধে বলেছেন —

> ইংরাজ পাদ্রীরা উনিশ শতকের গোড়াতে প্রথম বাংলা গদ্য প্রবর্তন করেন, এ কথার অর্থ এই যে, তারা আরবী ফারসী শব্দবিবর্জিত সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলা গদ্য প্রবর্তন করেন। ...ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিত এই সময় সংস্কৃত শব্দ ভারাক্রান্ত নূতন বংগ ভাষার প্রবর্তন করেন। এঁরা নিজেদের লেখা বই পুস্তকে বৌদ্ধ-মুসলিম-পর্তুগিজ প্রবর্তিত সুপ্রচলিত শব্দসমূহ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করেন। কলমকে 'লেখনী' কাগজকে 'ভুর্জপত্র' দোয়াতকে 'মস্যাধার' করার চেষ্টা এই সময় করা হয়। খাওয়াকে 'আহার করা' পরাকে 'পরিধান করা' বসাকে 'উপবেশন করা' ইত্যাদি সংস্কার শুরু করা হয় খুব দ্রুত গতিতেই। নদীয়াবাসী প্রতিভাবান সংস্কৃত পণ্ডিতদের শক্তিশালী লেখনী-মুখে বাংলা ভাষা যে সাহিত্যিক রূপ পায়, তার শব্দ প্রয়োগে বাক্যবিন্যাসে নদীয়ার বাকরীতি ও ভাষিক বৈশিষ্ট্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাময়িকভাবে বাংলা ভাষা সত্যসত্যই সংস্কৃতের পালিতা কন্যা হইয়া যায়। ভাষা ও সাহিত্য হিন্দু-বাংলা ও মুসলিম-বাংলার পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ হয়। (মনসুর, ১৯৯৫ : ৭৮-৭৯)

উনিশ শতকের পূর্বে পুঁথি সাহিত্য ব্যতীত মুসলিম সৃষ্ট কোন্ সাহিত্যে তথাকথিত ইসলামি সাহিত্যের বান ডেকেছিল, লেখক অবশ্য তার নজির দেননি। 'পাক-বাংলার রেনেসাঁ' প্রবন্ধে বলেছেন —

> পূর্ব-পাকিস্তান অর্থাৎ বাঙলা ও আসামের সাহিত্য বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য। ...তবু এ সাহিত্য পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। কারণ এটা বাঙলার মুসলমানের সাহিত্য নয়। এ-সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোন দান নেই শুধু তা নয়, মুসলমানদের প্রতিও এ-সাহিত্যের কোন দান নেই। অর্থাৎ এ-সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ কোন প্রেরণা পায়নি এবং পাচ্ছে না। এর কারণ আছে। সে কারণ এই যে এ-সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়; এর বিষয়-বস্তুও

> মুসলমান নয়। এর স্পিরিটও মুসলমান নয়; এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়। ...ঐ সাহিত্যকে মুসলমানরা তাদের জাতীয় সাহিত্য মনে করতে পারে না। কারণ ত্যাগ-বৈরাগ্য-ভক্তি-প্রেম যতই উঁচুদরের আদর্শ হোক, মুসলমানের জীবনাদর্শ তা নয়। হিন্দুর ধর্ম যেমন ত্যাগ বৈরাগ্য ও মুনি-ঋষির ধর্ম, মুসলমানের ধর্ম তেমনি হক-ইনসাফ ও জেহাদ-শহীদের ধর্ম। (মনসুর, ১৯৯৫ : ১০০-১০১)

আবুল মনসুর আহমদের এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা ধর্মীয় সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আমরা ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল বা মুজতবা আলী-জসীমউদ্‌দীনের উত্তরাধিকারী। 'আমাদের ভাষা' প্রবন্ধে বলেছেন —

> উনিশ শতকের গোড়া হইতে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা ভাষা ছিল পণ্ডিতী ভাষা। উনিশ শতকের শেষদিক হইতে টেকচাঁদ ঠাকুর দ্বিজেনঠাকুর ও রবিঠাকুরের শক্তিশালী কলমের জোরে ভদ্রলোকের পণ্ডিতী বাংলা জনগণের ভাষায় রূপান্তরিত হয়। ...দ্বিজেনঠাকুর রবিঠাকুর ও শরৎচন্দ্রের চেষ্টায় বাংলা ভাষা বড় জোর পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাষা হইতে পারিয়াছিল। প্রকৃত জনগণের ভাষা হইতে পারে নাই। কারণ বাংলার আসল জনগণ যে মুসলমানরাও এবং তাদের ভাষাও যে জনগণের ভাষা, এ সত্য হয়তো ঐ মনীষীদের নিকট ধরাই পড়ে নাই। ...অবিভক্ত বাংলায় বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল হিন্দুদের। তার মানে বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত এবং প্রধানত হিন্দু কালচারের বাহক। সে সাহিত্য বাংলার মুসলিম কালচারের বাহক ত ছিলই না বরঞ্চ তার প্রতি বিরূপ ছিল। (মনসুর, ১৯৯৫ : ১২৮-১২৯)

মীর মশাররফ হোসেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ এনামুল হক থেকে শুরু করে বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্যসেবীরা তাহলে কোন্ কালচারের বাহক? — লেখক সেটি স্পষ্ট করেননি। আবুল মনসুর আহমদের উল্লিখিত বক্তব্য থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার স্বরূপটি অনুধাবন করা যায়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে তাঁর বিরুদ্ধে বাঙালি মুসলমানের তথা পূর্ববঙ্গের পক্ষে এক ধরনের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা যায়, তথাপি এসব বক্তব্যের ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০), হিন্দু কলেজ (১৮১৭) ও সংস্কৃত কলেজের (১৮২৪) পণ্ডিতদের দ্বারা সৃষ্ট বাংলা ভাষার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা জনগণের মুখের ভাষার একটা মৌলিক পার্থক্য ছিল এবং সে-পার্থক্য শালীন-শোভন কেতাবি ভাষার সঙ্গে নিত্যদিনের ব্যবহারিক ভাষার। এই কেতাবি লেখ্য ভাষাকেই অভিহিত করা হয় সাধু ভাষা হিসেবে এবং এ-ভাষাই পরবর্তীকালে ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এখানেই আবুল মনসুর আহমদের আপত্তি, কেননা এর মধ্যে মুসলমানদের উপেক্ষা করা হয়েছে অত্যন্ত সচেতনভাবে। সমকালীন *সমাচার দর্পণ* (১৩ ডিসেম্বর ১৮৩১) পত্রিকার একটি উদ্ধৃতি থেকে এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় — First and formost the hautiness of the Javans— will be brought low which will be of much service to us. When the Bengali language is brought to use the Mussalmans will be driven out, for they are not and never will be able to read and write Bengali. (উদ্ধৃত : মনিরুজ্জামান, ১৯৬৯ : ৫৫-৫৬ ও মাহবুব, ১৯৮৫ : ৫) এই কাজের জন্য মূলত রাজনৈতিক কারণে উৎসাহ দিয়েছিলেন শাসকশ্রেণি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ যে মত প্রকাশ করেছেন তার সাথে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মতের মিল লক্ষ করা যায়। এঁরা পাকিস্তান আমলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকেই এ ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো বাংলা ব্যাকরণকে বেনামি ব্যাকরণ (সংস্কৃত) হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং বাংলা বানান ও পদবিন্যাসপ্রণালীকে পথভ্রষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করে সংস্কৃতানুসারী পণ্ডিতদের কঠোর সমালোচনা করেছেন।[৮] আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —

> গদ্য গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তক প্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই; সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। ...বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃততেই তাহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারা তেমনই জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল। এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। (বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৯৩ : ৩৬৯)

এ বক্তব্যে কোনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল না। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় — "বাংলা ভাষার উপর এই আর্য অত্যাচার বাঙালি যে বেশিদিন সহ্য করতে পারেনি, তার সাক্ষাৎ প্রমাণস্বরূপ ষাট বছর আগে বাঙালির ওড়ানো বিদ্রোহের দুটি লাল পতাকা আজো আমাদের সাহিত্য জগতে জ্বলজ্বল করছে। *আলালের ঘরে দুলাল* আর *হুতোম প্যাঁচার নকশা* যে বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিল তার সাক্ষী স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।" (প্রমথ, ২০১২ : ২৮০) আরবি-ফারসি শব্দবর্জিত সংস্কৃতঘেঁষা বাংলা ভাষার প্রচলন সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস বলেছেন — "১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আরবী-ফারসী নিসূদন যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী ফারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজির প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। ...ফলে দশ-পনর বৎসরের মধ্যে বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণই পরিবর্তিত হইয়াছিল।" (উদ্ধৃত : আবদুর রহিম, ১৯৯৪ : ১৪-১৫) অন্যদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'বাংলা গদ্যের খাত বদল' প্রবন্ধে যে কথা বলেছেন, তার সঙ্গে আবুল মনসুর আহমদের মতের মিল লক্ষ করা যায়। তিনি বলেছেন — "উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা যে খাত বদল করেছিল আজও সেই পথেই তার স্রোত বইছে। ...উনবিংশ শতকের সেই প্রথম-পর্বেই জনসাধারণের ভাষার সঙ্গে তার যে পার্থক্য রচিত হয়েছে আজও তা সমান্তরাল সরলরেখার মতোই চলছে। কলকাতার সঙ্গে বাংলার গ্রামের মতো এই সংস্কৃতে শুদ্ধকৃত বাংলার সঙ্গে প্রাচীন ভাষার মিলন দূরে থাক- তার ব্যবধান বোধ হয় বেড়েই চলেছে। আজ যখন বাঙালী লেখকের রচনা জনমনস্পর্শী হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে, তখন সেই অভিযোগের পেছনে শুধু নাগরিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যই নয় — দেড়শ বছর আগে বাংলা গদ্যের নববিধানও তার জন্য কতটা দায়ী, সে কথাটাও ভেবে দেখবার সময় এসেছে।" (নারায়ণ, ১৯৮০ : ৯২-৯৩) মূলত এই ভাবনাটাই ভেবেছেন আবুল মনসুর আহমদ। তাই তিনি সংস্কৃতঘেঁষা গদ্য সৃষ্টির পূর্বে

জনমনে যে ভাষার প্রচলন ছিল সেই ভাষাকে অর্থাৎ অনেকটা পুঁথি সাহিত্যের আরবি-ফারসি বহুল ভাষাকে ফিরিয়ে এনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

উনিশ শতকে হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা যে সংস্কৃতানুসারী বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার সমান্তরালে যেমন হিন্দু-সমাজের একটি অংশ এই ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করে জনসাধারণের মুখের ভাষাতে সাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি মুসলমানদের একটি অংশও পুঁথিসাহিত্যের পাশাপাশি প্রচলিত বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন; যদিও এই উভয় ধারাই প্রতিষ্ঠালাভে ব্যর্থ হয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল*, কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নকশা*, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের *সুশীলার উপাখ্যান* (১৮৫৯-৬৩), হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্সের *ফুলমনি ও করুণার বিবরণ* (১৮৫২) ও একজন অজ্ঞাত মুসলমান লেখকের রচিত *শাহ মখদুম জীবনী তোয়ারিখ* (১৮৩৮) (আবু তালিব, ১৯৭৯ : ৩৬) প্রভৃতি গদ্য রচনায় প্রয়োজন অনুযায়ী আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছিল এবং এঁদের ভাষাও ছিল সাধারণের মুখের ভাষার কাছাকাছি। বঙ্কিমচন্দ্র (১৩৯৩ : ৩৬৯) যেমন 'ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া' প্রভাবের বিপরীতে 'আলালী ভাষা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাংলাকে সংস্কৃত ভাষার নাগপাশে আবদ্ধ দেখে লজ্জা প্রকাশ করে তা থেকে বেরিয়ে আসার আহবান জানিয়েছিলেন[১]। "টেকচাঁদ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী কিংবা অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ এসেছে পুষ্পবৃষ্টির মত। নজরুল ইসলামের ভাষায় কালবৈশাখীর মত।" (রশীদ করিম, দৈনিক বাংলা ১৭/০২/১৯৭৪, উদ্ধৃত : নূরুর রহমান, ১৯৯০ : ৪৭৮) তাই বাংলা সাহিত্যে চলতিরীতির প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন– "বাংলা সাহিত্য থেকে আরবী ও ফারসী শব্দ বহিষ্কৃত করতে সেই জাতীয় সাহিত্যিকরাই উৎসুক, যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন না।" (উদ্ধৃত : মাহফুজউল্লাহ, ১৯৭১ : ১১১)। এ ক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারা বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর চিন্তাধারার অনুসারী হলেও তাতে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সকলেই চেয়েছেন জনগণের মুখের ভাষার কাছাকাছি বোধগম্য ভাষায় সাহিত্য রচিত হোক এবং এ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রয়োজনের তাগিদে সংস্কৃত-আরবি-ফারসি বা যে-কোনো বিদেশী শব্দ গ্রহণ করা যেতে পারে। আর আবুল মনসুর আহমদের সীমাবদ্ধতা এখানে যে, তিনি প্রথমত — বাঙালি মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, যেখানে প্রচলিত 'হিন্দু-সাহিত্যে'র বিপরীতে 'মুসলমানী সাহিত্য' সৃষ্টি হবে এবং দ্বিতীয়ত — সেই সাহিত্যের ভাষা হবে পূর্ববঙ্গের অধিভুক্ত (বর্তমান বাংলাদেশ) বাঙালি মুসলমানের মুখের ভাষা — যে ভাষা পশ্চিমবঙ্গের 'শান্তিনিকেতনী' ভাষার বিপরীতে পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানের আদর্শ ভাষা হিসেবে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। এজন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও ত্যাগ করতে প্রস্তুত, কেননা তাঁর মতে সে-সাহিত্য উক্ত দুটি বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডে পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানের ভাষাও নয়, সাহিত্যও নয়। কিন্তু তিনি একবারও ভেবে দেখেননি যে, এ সিদ্ধান্তের ফলে সৃজনশীল শক্তিমান মুসলমান লেখকদেরও বর্জন করতে হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বাংলা-উর্দু বিতর্কের সময় তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে অত্যন্ত শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন, কিন্তু সে বাংলা সাম্প্রদায়িক চেতনাগত পুঁথিসাহিত্যের বাংলা।

তিন

কবি-সাহিত্যিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে গিয়ে লেখক মার্কিনিদের সঙ্গে পূর্ব-বাংলার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। আঠার শতকের শেষে আমেরিকা ইংরেজদের থেকে স্বাধীনতা অর্জন করলেও দীর্ঘ একশ বছরের মধ্যে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি, কেননা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কিনিরা তখনো ইংরেজদের ধারাই আঁকড়ে রেখেছিল। অবশেষে বিশ শতকের গোড়ায় যখন ইমার্সন, জারট্রুড স্টেইন, এযরা পাউন্ড, টিএস এলিয়ট প্রমুখ চিন্তাবিদের প্রচেষ্টায় মার্কিনিরা ইংরেজদের অনুকরণ-অনুসরণ পরিত্যাগ করে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে শুধু মার্কিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল এবং স্বাতন্ত্র্যের মন্ত্রে উজ্জীবিত হলো, তখনই তারা বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারল। একইভাবে পূর্ব-বাংলার কবি-সাহিত্যিকরা যখন পশ্চিম-বাংলার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ব-বাংলার জনগণের মুখের ভাষা ও তাদের জীবনাচরণ নিয়ে স্বতন্ত্র ভাষা-সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন, কেবল তখনই স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ অনুভব করা যাবে। কিন্তু পূর্ব-বাংলার কবি-সাহিত্যিকরা তা না করায় লেখক ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং একই সাথে প্রকাশক-পাঠকদের সমালোচনা করেছেন —

> আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা আজ যেমন আমাদের নিজের ভাষার থনে পশ্চিম বাংলার ভাষাকেই অধিকতর সভ্য, ভদ্র, শালীন ও সাহিত্যের উপযোগী ভাষা মনে করেন, এককালে মার্কিন লেখক-সাহিত্যিকরাও ইংলন্ডের ইংরেজীকে তাই মনে করিতেন। ...এদেরও মডেল পশ্চিম বঙ্গের কথ্য ভাষা। এঁরাও মনের দিক হইতে বাস করেন পশ্চিম বংগে, পূর্ব-বাংলায় নয়। এরা যেন সত্য-সত্যই বিশ্বাস করেন পশ্চিম-বংগের কথ্য ভাষায় না লিখিয়া পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষায়, এমনকি শুদ্ধ বা কেতাবী ভাষায়, বই লিখিলে পূর্ব-বাংলার পাঠকরা তা কিনিবেন না, পূর্ব-বাংলার সাহিত্য-সমাজে তা স্বীকৃতি পাইবে না। ...পূর্ব-বাংগালীর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া যেমন কঠিন, মার্কিন জাতির পক্ষেও শেক্সপিয়ারের ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া ছিল তেমনি কঠিন। ...পূর্ব-বাংলার সাহিত্য স্বকীয়তা লাভ করে নাই। স্বকীয়তা লাভ করে নাই কেন? উত্তর, সাহিত্যিকরা এই নয়া রাষ্ট্রীয় পরিবেশের সহিত নিজেদের এডজাস্ট করিতে পারেন নাই। উনিশ শ সাতচল্লিশ সালে তাঁরা যে পথে যে দিকে চলিতেছিলেন, আজো সেই পথে সেই দিকে চলিয়াছেন। যেন ইতিমধ্যে নতুন কিছু ঘটে নাই, নয়া দেশ নয়া জাতি সৃষ্টি হয় নাই, ভাবটা যেন এই। (মনসুর, ১৯৯৫ : ৪৯-৫৬)।

তিনি পশ্চিমবঙ্গের ভাষা-সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণের জন্য আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের গোলামী মনোভাবকে দায়ী করেছেন এবং সে হিসেবে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যকে 'গোলামী সাহিত্য' হিসেবে অভিহিত করেছেন। লেখক তাঁর ভাষা-বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে[১০] একাধিকবার এই গোলামী সাহিত্যের পরিচয় তুলে ধরে তা থেকে বের হবার আহবান জানিয়েছেন। ভাষায় গোলামী, সাহিত্যে গোলামী, সংস্কৃতিতে গোলামী, পোষাক-পরিচ্ছদে গোলামী, এমনকি খেলাধুলায়ও গোলামীর পরিচয় দিয়ে এসব কিছুতে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির দাবি জানিয়েছেন। নিচের ছকে পশ্চিমবঙ্গীয় ও পূর্ববঙ্গীয় বাংলাভাষার বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদের পার্থক্য দেখিয়ে আবুল মনসুর আহমদের প্রস্তাব দেখানো হয়েছে —

বিষয়	সাধুরূপ	পশ্চিমবঙ্গীয় রূপ	পূর্ববঙ্গীয় রূপ
	(উভয় বাংলায় আদর্শ লেখ্যরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত)	(বর্তমানে উভয় বাংলার চলতি বা আদর্শ রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত)	(পূর্ববাংলার কোনো কোনো অঞ্চলের কথ্যরূপ, যা আবুল মনসুর আহমদের দৃষ্টিতে পূর্ববাংলার আদর্শ রূপ হিসেবে প্রচলিত/প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত)
	বসাইয়া, করাইয়া, পড়াইয়া, মুছাইয়া, লিখাইয়া, পরাইয়া, বেড়াইয়া ইত্যাদি	বসিয়ে, করিয়ে, পড়িয়ে, মুছিয়ে, লিখিয়ে, পরিয়ে, বেড়িয়ে ইত্যাদি	বসায়া/বসায়ে, করায়া/করায়ে, পড়ায়া/পড়ায়ে, মুছায়া/মুছায়ে, লিখায়া/লিখায়ে, পরায়া/পরায়ে, বেড়ায়া/বেড়ায়ে ইত্যাদি
ক্রিয়াপদ	করিতেছি, দেখিতেছি, পরিতেছি, পড়িতেছি, বসিতেছি, মুছিতেছি, লিখিতেছি ইত্যাদি	করছি, দেখছি, পরছি, পড়ছি, বসছি, করছি, মুছছি, লিখছি ইত্যাদি।	করতেছি, দেখতেছি, পরতেছি, পড়তেছি, বসতেছি, মুছতেছি, লিখতেছি ইত্যাদি
	করিয়াছি, দেখিয়াছি, পরিয়াছি, পড়িয়াছি, বসিয়াছি, মুছিয়াছি, লিখিয়াছি ইত্যাদি পুরাঘটিত বর্তমান কলের রূপ, যার ঘটমান বর্তমান কালের রূপ হলো– করিতেছি, দেখিতেছি, পরিতেছি, পড়িতেছি, বসিতেছি, মুছিতেছি, লিখিতেছি ইত্যাদি	করছি, দেখছি, পরছি, পড়ছি, বসছি, মুছছি, লিখছি, ইত্যাদি পদ ঘটমান বর্তমান কাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার পুরাঘটিত বর্তমান কালের রূপ হলো– করেছি, দেখেছি, পরেছি, পড়েছি, বসেছি, মুছেছি, লিখেছি, ইত্যাদি পদ	করছি, দেখছি, পরছি, পড়ছি, বসছি, করছি, মুছছি, লিখছি, ইত্যাদি পদ পুরাঘটিত বর্তমান কাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার ঘটমান বর্তমান কালের রূপ হলো– করতেছি, দেখতেছি, পরতেছি, পড়তেছি, বসতেছি, করতেছি, মুছতেছি, লিখতেছি ইত্যাদি।
	খাইয়াছি, বেড়াইয়াছি, করিয়াছি, ঘুমাইয়াছি, দেখিয়াছি, পরিয়াছি, পড়িয়াছি, বসিয়াছি, মুছিয়াছি, লিখিয়াছি ইত্যাদি	খেয়েছি, বেড়িয়েছি, করেছি, ঘুমিয়েছি, দেখেছি, পরেছি, পড়েছি, বসেছি, মুছেছি, লিখেছি ইত্যাদি	খাইছি, বেড়াইছি, করিছি, ঘুমাইছি, দেখিছি, পরিছি, পড়িছি, বসিয়াছি, মুছিছি, লিখিছি ইত্যাদি
	যাহিবা, খাহিবা, লহিবা, করিবা, পড়িবা, দেখিবা হাসিবা ইত্যাদি	যাবে, খাবে, নেবে, করবে, পড়বে, দেখবে, হাসবে ইত্যাদি	যাবা/যাইবা, খাবা/খাইবা, নিবা, করবা, পড়বা, দেখবা, হাসবা ইত্যাদি
নামপদ	সুতা, রুপা, তুলা, জুতা, উল্টা, ইচ্ছা, মিঠা, হিসাব, নিকাশ ইত্যাদি	সুতো, রুপো, তুলো, জুতো, উল্টো, ইচ্ছে, মিঠা, হিসেব, নিকেশ ইত্যাদি	সুতা, রুপা, তুলা, জুতা, উল্টা, ইচ্ছা, মিঠা, হিসাব, নিকাশ ইত্যাদি, সাধুরূপটি অবিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

তিনি পূর্ববঙ্গীয় রূপটির নাম দিয়েছেন 'ঢাকাইয়া বাংলা'। প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত 'কলকাতাইয়া বাংলা'র বিপরীতে পূর্ব-বাংলার আদর্শ কথ্যরূপ হবে এই 'ঢাকাইয়া বাংলা'। তাঁর মতে — 'কলকাতাইয়া বাংলা'র স্থানে 'পূর্ব-বাংলার স্টান্ডার্ডাইয্‌ড কথ্য বাংলা' অর্থাৎ

ঢাকাইয়া বাংলাই হবে আমাদের গল্প-উপন্যাস ও স্টেজ-সিনেমার সংলাপের ভাষা। এই ভাষাকে সাহিত্যে প্রয়োগের জন্য লেখক দুটি নির্দেশনা দিয়েছেন। এক. "প্রবন্ধে-নিবন্ধে তাঁরা সর্বদাই সহজ সাধু বা লেখ্য ভাষা ব্যবহার করিবেন" এবং দুই. "গল্পকার ও ঔপন্যাসিকরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসে গল্পকারের ভাষা সাধু রাখিবেন। শুধু পাত্র-পাত্রীর ভাষা কথ্য করিবেন।" (মনসুর, ১৯৯৫ : ৬৯)

চার

বিভিন্ন বিদেশি শব্দের পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভাগ-পরবর্তী বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি বা অন্যান্য ভাষায় লেখা বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের বাংলায় অনুবাদ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজি মাধ্যমে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে বাংলা মাধ্যমে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণে এক বিরাট বাধা ছিল বাংলা পরিভাষার সৃষ্টি। এজন্য গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন পরিভাষা কমিটি। আর পরিভাষা সৃষ্টির আগে বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা চালু করা যায় না বলে যাঁরা ইংরেজি মাধ্যমকেই আবার চালু রাখতে চেয়েছিলেন, লেখক তাঁদের তীব্র সমালোচনা করে পরিভাষাবিষয়ক মত তুলে ধরেছিলেন। লেখকের মতে) — "পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টা যে কত কৃত্রিম অনাবশ্যক ও অসংগত চেষ্টা, অর্থ শক্তি ও সময়ের যে কতবড় অপচয়, সুধী সমাজকে তা বুঝাইবার চেষ্টা করাও সময় ও শক্তির অপচয় মাত্র। যে শব্দ বাংলাদেশের সকলে বুঝে ও বলে, সেটাই বাংলা শব্দ। যে ভাষায় আমরা রোজ কথা কই, যে ভাষায় ছাত্র-শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করেন সেটাই বাংলা ভাষা। তার আবার পরিভাষা কি?" (মনসুর, ১৯৯৫ : ৮২) ইংরেজি ভাষাতেও প্রচুর গ্রিক, জার্মানি, ফারসি, ইতালি শব্দ পাওয়া যায়– যার কোনো প্রতিশব্দ করা হয় নাই। আসলে এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় ব্যবহৃত হলে এবং তা দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করলেই তার আর পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন পড়ে না, এমনিতেই সেটি ভাষার অঙ্গ হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন যাবৎ ফারসি এদেশের রাষ্ট্রভাষা থাকায় অজস্র আরবি-ফারসি শব্দ যেমন বাংলা হয়ে গেছে, তেমনি অজস্র ইংরেজি শব্দও বাংলা হয়ে গেছে। তাই এসব শব্দের আর নতুন করে পরিভাষা সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন নেই। ইংরেজি থেকে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক অনুবাদের ক্ষেত্রে যেসব ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নাই, সেসব শব্দের জন্য কষ্ট করে বাংলা প্রতিশব্দ না বের করে তা অবিকল রেখে দেয়ার পক্ষেই লেখক মত প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া আমরা সচরাচর মুখের ভাষায় যে-সকল ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি লেখার ক্ষেত্রেও তা ব্যবহার করা সংগত এবং এতে বাংলা ভাষা আরো সমৃদ্ধ হবে। কেননা ভাষার উদ্দেশ্যই হলো নিজের মনের ভাব অপরকে বোঝানো এবং সেক্ষেত্রে যে শব্দ আমরা বলি বা বুঝি ও কথাবার্তায় প্রয়োগ করি সে শব্দের মূল বিদেশী হলেও তা বাংলা শব্দ। আবার অনেক বিদেশী শব্দ আছে যা কিছুটা বিকৃত হয়ে বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন— হাসপাতাল (হসপিটাল), আর্দালি (অর্ডারলি), বোতল (বটল), ডাক্তার (ডক্টর), টেবিল (টেব্‌ল) এমনি হাজারো মূল ভাষার বিকৃত শব্দ এখন পুরোপুরি বাংলা। এক্ষেত্রে সাধারণ জনগণই ঐসব বিদেশি শব্দের পরিভাষা সৃষ্টি করেছে। "এদের মুখে উচ্চারিত বিদেশী

শব্দসমূহের যে রূপকে পণ্ডিতেরা বলেন অপভ্রংশ, আসলে সেগুলিই ঐসব শব্দের বাংলা রূপ, সুতরাং আমাদের পরিভাষা।" (মনসুর, ১৯৯৫ : ১১১)। তাই লেখকের মতে, আমাদের ভাষায় যে-সব ইংরেজি বা বিদেশী শব্দ চালু আছে সে-সব শব্দের প্রতিশব্দ বের করার চেষ্টা নিছক পাগলামি। (মনসুর, ১৯৯৫ : ১৩৭)। ভাষার পরিচয় মূলত ক্রিয়াপদে, তাই ক্রিয়াপদ ঠিক রেখে বাক্যের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বিদেশি শব্দ ব্যবহার করলে তা বাংলাই থাকবে এবং শিক্ষিত মহলে সাধারণত এভাবেই কথোপকথন হয়। লেখক মূলত সুধী সমাজের ব্যবহৃত মুখের ভাষাকেই বাংলা ভাষার আদর্শ লেখ্যরূপ হিসেবে চালু করতে চেয়েছেন। আর সেটা মেনে চললেই বিদেশি শব্দের জন্য আলাদা করে পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন হবে না। এক্ষেত্রে লেখকের অভিমত—

> পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টায় সাহিত্যিকদের প্রতিভার অপচয় না করিয়া যে-সব বিদেশী শব্দ আমাদের কথাবার্তায় চলিয়া গিয়াছে, সেগুলি অকাতরে বই-পুস্তক ও গোটা সাহিত্যে চালু করিয়া দেওয়া উচিত। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা এবং অফিস-আদালতের অফিসাররা তাঁদের যাঁর-তাঁর এলাকায় কথা বলিবার সময় যে-সব বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেন, লিখিবার সময়ও বাংলা হরফে সেই সব শব্দ ব্যবহার করিবেন। এতে গৌরব হানি হইবে না। ভাষার বিন্দুমাত্র অবনতি ঘটিবে না। বরঞ্চ তাতে আমাদের ভাষার শব্দ-সম্পদ বাড়িয়া যাইবে। এই ইলাস্টিসিটি ভাষাকে দ্রুত আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় পরিণত করিবে। (মনসুর, ১৯৯৫; ১৩৯)

তাঁর এ বক্তব্য যৌক্তিক। বিভাগ-পরবর্তী সময়ে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায় বাংলাদেশের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গেও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি পরিভাষা কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার জন্য খ্যাতনামা সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদদের সভায় লেখককেও ডাকা হয়েছিল। রিপোর্টে প্রচলিত ইংরেজি শব্দের যে-সব বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছিল, লেখক তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। ফলে সে রিপোর্ট গৃহীত হতে পারেনি। বাংলাদেশেও পরিভাষা সৃষ্টির অজুহাতে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে যাঁরা গড়িমসি করছিলেন, লেখক তাঁদের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

পাঁচ

আবুল মনসুর আহমদের ভাষাচিন্তার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরিতে অত্যন্ত দূরদর্শী ও সাহসী ভূমিকা। সাতচল্লিশ-পূর্ব সম্মিলিত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন যখন দ্বিধাবিভক্ত এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলন তুঙ্গে, তখন তিনি এই আন্দোলনের একজন প্রধান সাংস্কৃতিক-তাত্ত্বিক হিসেবে কল্পিত স্বাধীন বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম) রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন তোলেন। যেখানে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না-কি উর্দু তা নিয়ে বহু আগে থেকেই একটা বিতর্ক চলে আসছিল এবং মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায় বলে আসছিলেন যে "বাঙালী মুসলমানের ভাষা বাংলা নহে, 'দোভাষী-বাংলা'ও নহে, একেবারে সরাসরিভাবেই 'উর্দু' " (এনামুল, ১৯৬৮ : ৩০৩) সেখানে আবুল মনসুর

আহমদ অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত কল্পিত স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা হিসেবে বাংলাভাষার পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন। লাহোর প্রস্তাবে ধর্মের ভিত্তিতে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল এবং সে হিসেবে পূর্ববাংলা, পশ্চিমবাংলা ও আসাম নিয়ে পৃথক একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিল। এ লক্ষ্যে মুসলিম লীগের ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি দেশবিভাগের চার বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৩ সনে 'মাসিক মোহাম্মদী'[১১] (১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫০) পত্রিকায় 'পূর্ব্ব-পাকিস্তানের জবান' নামক এক প্রবন্ধে তিনি বলেন —

> কোনো জাতির মাতৃভাষা বদলিয়ে এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এটা একেবারেই অসম্ভব সে জাতিতে যে জাতির লোকসংখ্যা প্রায় চার কোটি। বাঙলা ভাষাভাষী মুসলমানের সংখ্যা তাই। ওদের সকলকে বাঙলা ছাড়িয়ে উর্দু শেখাবার চেষ্টা পাগলামী মাত্র। ...অথচ **উর্দু নিয়ে এই ধস্তাধস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাঙলাকেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করি**, তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মুসলিম বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়ণে হাত দিতে পারবো। আমাদের নিজেদের বুদ্ধি, প্রতিভা ও জীবনাদর্শ দিয়েই আমাদের জনসাধারণকে উন্নত, আধুনিক জাতিতে পরিণত করবো। জাতির যে অর্থ, শক্তি, সময় ও উদ্যম উর্দু প্রবর্তনে অপব্যয় হবে, তা যদি আমরা শিক্ষা-সাহিত্যে, শিল্পে-বাণিজ্য নিয়োজিত করি, তবে পূর্ব-পাকিস্তানকে আমরা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মুসলিম জগতের, এমনকি গোটা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করতে পারবো।

আমাদের জানামতে এটিই ছিল দেশবিভাগের পূর্বে কল্পিত স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা ও জাতীয় ভাষা হিসেবে বাংলাভাষাকে গ্রহণ করার প্রথম দাবি। দেশবিভাগের উত্তাল সময়ে আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদক। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দেশবিভাগের পূর্বে ও পরে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সনের ২২ ও ২৯ জুন তারিখে ভাষাসৈনিক আবদুল হকের 'বাংলাভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ দুই কিস্তিতে 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দেশবিভাগের পরেও আবুল মনসুর আহমদ কলকাতায় থেকে গিয়ে 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করতে থাকেন। ১৯৪৭ সনের ১৫ সেপ্টেম্বর তমুদ্দুন মজলিস 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা — না উর্দু' শিরোনামে যে পুস্তিকাটি প্রকাশ করে তাতে দুটি প্রবন্ধ স্থান পায়। (কাশেম, ১৯৭১ : ৭০) এর একটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক কাজী মোতাহের হোসেনের 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা' নামক প্রবন্ধ এবং অন্যটি ছিল আবুল মনুসর আহমদের 'বাংলা ভাষাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন — "উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারি চাকুরির 'অযোগ্য' বনিয়া যাইবেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী কাজের 'অযোগ্য' করিয়াছিল।" (উদ্ধৃত : বদরুদ্দীন, ১৯৭৩ : ১৮)। এছাড়াও তিনি ১৯৪৭-৪৮ সনে কলকাতায় থেকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষা

আন্দোলনের বিভিন্ন কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নাজিমুদ্দিন সরকার বাংলাদেশে 'দৈনিক ইত্তেহাদে'র প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে ময়মনসিংহের 'কমিটি অব এ্যাকশনে'র দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ২১ দফা মেনিফেস্টোর রচয়িতা হিসেবে তিনি এর ১নং দফায় বাংলাকে
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, ১৭ নং দফায় ভাষাশহীদদের জন্য একটি শহীদ মিনার নির্মাণ ও ১৮ নং দফায় শহীদ দিবস হিসেবে ২২ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণার প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করেন। (আজাদ ও রেজা, ১৯৮৭ : ১২৭-১২৯)। এসব বিষয়ে তাঁর চিন্তা ও কর্ম অত্যন্ত প্রশংসনীয় হলেও সরকারিভাবে বেতার ও টেলিভিশনে যখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করা হয় এবং বাংলাভাষার সংস্কারের নামে বাংলা বর্ণমালা পরিবর্তন, সংক্ষিপ্তকরণ ও আরবি বা রোমান লিপির প্রবর্তনের অপচেষ্টা হয় তখন দুঃখজনক হলেও সত্য যে আবুল মনসুর আহমদ সরকারের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আর এখানেই তাঁর সীমাবদ্ধতা।

ছয়

আবুল মনসুর আহমদের ভাষাচিন্তা কয়েকটি ধাপে অগ্রসর হয়েছে এবং সে অনুযায়ী তিনি সাহিত্যে তার প্রতিফলনও ঘটিয়েছেন। তাঁর লেখায় আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার, গল্প-উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর সংলাপে পূর্ব-বাংলার কথ্যভাষার ব্যবহার ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সহজ সাধুরীতির পূর্ববঙ্গীয় রূপের ব্যবহার, পরিভাষার ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ না লিখে তার ব্যবহারিক রূপের প্রয়োগ এবং সর্বোপরি সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসেবে তিনি পূর্ববঙ্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে তিনি যে আদর্শ লালন করতেন এবং যে আদর্শ বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে কবি-সাহিত্যিকদের দায়ী করে তাঁদের কঠোর সমালোচনা করেছেন, সে আদর্শ তিনি নিজের লেখায় যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি। অবশ্য তিনি তা স্বীকার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষায় পূর্ববঙ্গীয় সাহিত্য রচনার বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন— "বাংলা সাহিত্যে কথ্যভাষা প্রবেশ করায় এবং স্বাভাবিক কারণেই সে কথ্যভাষা পশ্চিম বাংলার কথ্যভাষা হওয়ায় পূর্ব-বাংলার সাহিত্য-প্রতিভার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। ...শুধু গল্প-উপন্যাসেই নয়, গুরুগম্ভীর সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ-নিবন্ধও লেখা হইতে লাগিল কথ্যভাষায়। পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিকরা এমনকি পূর্ব-বাংগালী মুসলমান, সাহিত্যিকরাও, এই বিপুল মিছিলের চাপ ঠেকাইতে পারিলেন না। তাঁরাও 'যিন্দাবাদ' বলিয়া এই মিছিলে শামিল হইয়া গেলেন। আমি নিজেও।" (মনসুর, ১৯৯৫ : ৪৯-৫৬) তবে এই স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও বলা যায়, তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে পূর্ব-বাংলার আদর্শ কথ্যরূপ ব্যবহারের যে চেষ্টা করেছেন, তা যেমন ব্যতিক্রমী, তেমনি সেটা তাঁর নিজস্বতা হিসেবেই বিবেচ্য। দেশভাগের পূর্বে ও পরে লেখা গল্প-উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর সংলাপে-বর্ণনায় তিনি সচেতনভাবেই পূর্ব-বাংলার কথ্যরূপ ব্যবহার করেছেন। এ-বিষয়ে লেখকের বক্তব্য —

> বাংলা বাটোয়ারা হওয়ার আগে পূর্ব-বাংলার মুখের ভাষার প্রতি আমার এই দরদ ছিল আঞ্চলিক আত্মসম্মানের প্রশ্ন। কলিকাতা রাজধানী রাখিয়াও এবং বাংলাদেশ অখণ্ড রাখিয়াও যে বাংলা সাহিত্য থাকিত, তাতে পূর্ব-বাংলার মুখের ভাষা উপেক্ষিত হইবে, এতে আমি অপমান বোধ করিতাম। সেজন্য আমার 'জীবন-ক্ষুধা'য় এবং তারও আগে ছোটগল্পে পূর্ব-বাংলার কথ্যভাষাকে স্থান দিবার চেষ্টা করিতাম। দেশ ভাগ হইয়া পূর্ব-বাংলা প্রথমে পূর্ব-পাকিস্তান ও পরে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ হওয়ার পরে এই আঞ্চলিক আত্মমর্যাদাবোধই জাতীয় মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে। কাজেই দেশভাগের পরে আমি আমার কোনও বই—এই গ্রন্থকার বা গল্পকারের ভাষায়—ত নয়ই, অপশ্চিম-বাংগালী পাত্র-পাত্রীর ডায়লগেও পশ্চিম-বাংলার কথ্যভাষা প্রয়োগ করি নাই। তার বদলে পূর্ব-বাংলার শিক্ষিত সমাজের সফিস্টিকেটেড ও পরিমার্জিত কথ্যবাংলা ব্যবহার করিয়াছি। এই সব গ্রন্থে মন্ত্রী, মেম্বর, অধ্যাপক, প্রিন্সিপাল, ডাক্তার, বিচারক, উকিল, মোক্তার সবার মুখে এই ভাষা দিয়াছি। আমার 'সত্যমিথ্যা' ও 'আবেহায়াত' নামের নভেল, 'গালিভরের সফর-নামা' ও 'আসমানী পর্দা' নামক গল্পের বই-এ এই নিয়ম মানিয়া চলিয়াছি। (মনসুর, ১৯৮৮ : ৩১২)

এসব গল্প-উপন্যাসে পূর্ব-বাংলার কথ্যভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগও লক্ষ করা যায়। মূলত বিভাগপূর্ব বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-লেখকদের রচনায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ ও মুসলমান লেখকদের রচনায় কিছু প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর লেখায় প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দও ব্যবহার করেছেন। ১৯২৪ সনে ছোটদের উপযোগী কাসাসুল আম্বিয়ার বেশকিছু গল্প নিয়ে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ *মুসলমানী কথা*-য় এত পরিমাণে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছিলেন যে কলকাতার বিখ্যাত প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা ভট্টাচার্য এন্ড সন্স তার কপিরাইট ক্রয় করার পরও আরবি-ফারসি শব্দের আধিক্যের কারণে তারা আবার তা ফিরিয়ে দেন। একইভাবে ১৯৩৪ সনে প্রকাশিত চারখণ্ডের শিশুপাঠ্য *নয়াপড়া* পাঠ্যপুস্তক হিসেবে সরকারি অনুমোদন পাওয়ার পরেও আরবি-ফারসি শব্দের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রয়োগের কারণে তার অনুমোদন বাতিল হয়। তারপরেও লেখক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর রক্ষণশীল মনোভাব থেকে সরে আসেননি। আর তা আরো প্রকট আকার ধারণ করে তাঁর ব্যঙ্গরচনায়। এমনিতেই *আলালের ঘরে দুলাল* বা *হুতোম প্যাঁচার নকশা* থেকে শুরু করে ব্যঙ্গরচনার ধারায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে বেশি। বস্তুত ব্যঙ্গরচনায় প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগের একটা ধারাবাহিকতা ছিল। (আনিসুজ্জামান, ২০০০ : ৬৪)। তবে তা কখনোই প্রচলিত বাংলা শব্দের পরিবর্তে নয়। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গরচনায় সাধারণভাবে এবং ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন ব্যঙ্গগল্পে বিশেষভাবে অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য আরবি-ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অবশ্য লেখক বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধে ও আত্মকথায় সাধারণ মানুষ অতি সহজে বুঝতে পারে ও সবসময় ব্যবহার করে এমন বিদেশি শব্দ প্রয়োগের কথা বলেছেন এবং নিজেও সেরূপ করেছেন বলে দাবি করেছেন, কিন্তু তা যে বাস্তবে ততটা হয়নি তার প্রমাণ তাঁর বিভিন্ন ব্যঙ্গগল্প। 'হুজুর কেবলা' গল্প থেকে একটু নমুনা দেয়া হলো —

> আমি গরিব কথায় দুনিয়াবি গৌরবৎ বুঝাই নাই। মুসলমানদের জন্য দুনিয়ার ধন-দৌলত হারাম। এই ধন-দৌলত এন্‌সানের রুহানিয়ত হাসেলে বাধা জন্মায়, তার মধ্যে নফসানিয়ত পয়দা করে। আল্লাহতালা বলিয়াছেন : (আরবি ও উর্দু) বেশক দুনিয়ার ধন-দৌলত শয়তানের ওয়াস-ওয়াসা, ইহা হইতে পলায়ন কর : তোদের অনেকেই এখন দোযখের দরজাতেই পড়িয়া আছিস। যে করে জলী ও জিকরে খফী — এই দুই দরজার জিকির সারিয়া পরে ফেকেরের দরজায় পঁহুছিতে হয়। ফেকের হইতে জহুর এবং জহুর হইতে মোরাকেবা-মোশাহেদার কাবেলিয়ত হাসেল হয়। খোদার ফযলে আমি আরেফিন, সালেহীন ও সিদ্দিকিনের মোকামাতের বিভিন্ন দায়েরার ভিতর দিয়া যেভাবে এলমে-লাদুন্নির ফয়েজ হাসেল করিয়াছি, তোদের কলব অতটা কুশাদা হইতে অনেক দেরি-অনেক —
>
> ...আজ তোমরা তাজ্জব হইতেছ। কিন্তু ইনশা-আল্লাহ, যখন তোমরা মোরাকেরায়ে-নেসবতে বায়নান্নাসে তালিম লইবে, তখন অপরের নেসবত সম্বন্ধে তোমাদের কলব আয়নার মতো রওশন হইয়া যাইবে। আলগরজ ইহাও খোদার এক শানে-আজিম।
>
> ...তোমরা আমার নুৎফার ছেলের মতো। তথাপি তোদের নিকট হইতে আমাকে অনেক গায়েবের কথা গোপন রাখিতে হয়। কারণ তোমরা সে-সমস্ত বাতেনী কথা বরদাশত করিতে পারিবে না। জেকের ও ফেকের দ্বারা কলব কুশাদা করিবার আগেই কোনও বড় রকমের নূরে তজল্লী তাতে ঢালিয়া দিলে কলব অনেক সময় ফাটিয়া যায়। এলমে লাদুন্নি হাসেল করিবার আগে আমি একবার লওহে-মাহফুজে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন আমি মাত্র দায়েরায়ে হকিকতে-লাতা-আইউনে তালিম লইতেছিলাম। সায়েরে নাজাবীর ফয়েজ তখনও আমার হাসেল হয় নাই। কাজেই আরশে-মওয়াল্লার পরদা আমার চোখের সামনে হইতে উঠিয়া যাইতেই আমি নূরে ইজদানি দেখিয়া বেহুশ হইয়া পড়িলাম। (মনসুর, ১৯৯৮ : ১৬-১৭)

এভাবেই লেখক তাঁর ব্যঙ্গরচনায় প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অপ্রচলিত শব্দও ব্যবহার করেছেন, যা সাধারণের বোধগম্য নয়। তাঁর বিভিন্ন গল্প থেকে এরূপ অনেক শব্দ যেমন — কোরা, কল্লিদার, হকিকতান, তরক্কি, জযবা, সলুক, ফানা-বাকা, জমিরের রওশনী, মোকাম্মেল, সালেক, মজযুব, জিরারত, দায়েরায়ে হকিকত, জয্‌বায়েযাতী, হোব্বে এশ্‌ক, মেস্‌মার, তাসাউওয়াফ, তাওয়াজ্জোহ, লতিফা, জেকরে-জলী, খেলওয়াৎ-দর-আঞ্জুমান, আহাদিয়াত, ফয়েজ, ফানাফিল্লাহ, আল্‌মে-খাল্‌ক, আলমে আমর, লকবধারী, মোওয়াজেযাত, জিকরে-খফা আম, না-মোমকেন, কাওয়ানেন, জওয়াশা, কামালিয়ত, রেজামন্দী, সাফা, তঙ্গদস্তি, বরহকত্ব, বেশুমারত্ব, রজিল, ইয়াকুৎ, সাটিন, চওগা, মাইয়েৎ, ফওরান, মোজতাহেদ, উম্মরভর, এজতেহাদ, জান নেসার, হুরমত, কদরদানি, লেখেন, মগর, ইয়ানে, ওগায়রা, রেওয়ায়েৎ, জুলুম-সেতম, চাওগার দামন, গায়ের মোকাল্লেদ, রাফেজি, মোতেমারাদি, শাহওয়াত, গালেব, মোনাসিব, পাহছান, তনঘা, লকব, খিলকাত, পরদায়েশ, সিলসিলা ইত্যাদি। এরূপ অজস্র অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দকে কোনো ক্রমেই বাংলা শব্দ বলে চালিয়ে দেয়া যায় না। ১৯৪৭ সনে দেশবিভাগের পর এই মাত্রা আরো বেড়ে যায়। বাংলা ভাষায় এরূপ অতিরিক্ত আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের প্রয়োগের বিরুদ্ধে সৈয়দ এমদাদ আলী, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ সাহিত্যিক-চিন্তাবিদ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। (আনিসুজ্জামান, ২০০০ : ৬৩)। তবে কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, শওকত ওসমান প্রমুখ ব্যতীত অন্যদের রচনায় অতিরিক্ত

আরবি-ফারসি শব্দের ভিড়ে বাংলা শব্দ হারিয়ে যেতে বসেছিল। (আনিসুজ্জামান, ২০০০ : ৬৪)। আরবি-ফারসি শব্দের অতিরিক্ত প্রয়োগের পাশাপাশি আবুল মনসুর আহমদের ভাষার আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা স্বাভাবিক কথোপকথনে যে-সব ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি সে-সবের প্রতিশব্দ না করে সরাসরি তার বাংলা উচ্চারণ ব্যবহার। আর একেই তিনি বলেছেন 'পূর্ব-বাংলার স্টান্ডার্ডাইয্‌ড সফিস্‌টিকেটেড কথ্যভাষা' — যা তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

সাত

সবমিলিয়ে আবুল মনসুর আহমদের ভাষাচিন্তা ও সাহিত্যাদর্শের মূল বৈশিষ্ট্য হল — বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ববাংলার কথ্যভাষাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা এবং সে-ক্ষেত্রে প্রচলিত 'কলকাতাইয়া বাংলা'র পরিবর্তে 'ঢাকাইয়া বাংলা'কে প্রতিষ্ঠিত করা। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ লেখক মুসলমান হওয়ায় বাংলা সাহিত্যকে পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্কৃতানুসারী লেখকদের থেকে মুক্ত করে আরবি-ফারসিবহুল বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা — যা হবে পুঁথি সাহিত্যেরই পরিমার্জিত রূপ। কিন্তু ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখকের এই আদর্শ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। বাংলাদেশের অনেক সাহিত্যিকের রচনায় পাত্র-পাত্রীর সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার হলেও বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা আঞ্চলিক আনুগত্যের দ্বারা প্রভাবিত হননি। এক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদ ব্যতিক্রম। লেখকের এই ভাষারীতি ও সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে বিশিষ্টজনদের অভিমত বা মন্তব্য স্মরণযোগ্য —

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মন্তব্য —

> সাহিত্যে তিনি জনগণের মুখের ভাষা চান, অথচ চলতি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর তুমুল আপত্তি– কেননা এ হল 'টেডিয়ম', তার উপদেশ সহজ সাধু বা লেখ্য ভাষা ব্যবহার করবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে জনগণের নয়, মধ্যবিত্তের কর্তৃত্বই তাঁর ইঙ্গিত। কিন্তু এ মধ্যবিত্ত যে সে মধ্যবিত্ত অবশ্যিই নয়, সে যদি হয় কুষ্টিয়া কি দিনাজপুরের, চট্টগ্রাম কি সিলেটের, তাহলে অচল, তার হওয়া দরকার আবুল মনসুর আহমদের নিজের অঞ্চলের মানুষ এবং সে যদি শুদ্ধ বাংলায় কথা বলে তাহলেও সে খারিজ। ওদিকে আবার তিনি যে আঞ্চলিকতার সমর্থন করেন তাও নয়। তাঁর দাবী স্টান্ডার্ড বাংলা, এবং তিনি নিজেই ঐ স্টান্ডার্ড। (সিরাজুল, ১৩৭৬ : ১০২)

আনিসুজ্জামান বলেছেন —

> পূর্ব বাংলার উপভাষাগুলোকে একটা সাধারণ ও শিষ্ট রূপদান করে তাকে সাহিত্যের আদর্শ ভাষায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। বাংলা সাহিত্যে যে ভাষা আদর্শ বলে স্বীকৃত তার বিকাশ কলকাতা-কেন্দ্রিক হওয়ায় এবং তার গঠনে পশ্চিম বাংলার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকায় সে ভাষাকে তিনি অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাবিত আদর্শ ভাষার নমুনা পাওয়া যায় তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায় এবং শেষদিকে লেখা প্রবন্ধাবলিতে। সাধুভাষার ক্রিয়াপদ অক্ষুণ্ন রেখে তিনি আরবি-ফারসি-ইংরেজি ভাষা এবং ময়মনসিংহের উপভাষা থেকে অবাধ শব্দচয়ন করেছেন। ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) ও আবুল কাসেম (১৯২০-১৯৯১) এ বিষয়ে তাঁর মতানুসারী : তাঁদের রচনায় আঞ্চলিক ভাষার শব্দ, বাক্যাংশ ও বাগবিধির যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। তবে ভাষার এই ভঙ্গি তাঁদের নিজস্ব রীতি বলেই পরিগণিত হয়েছে, সাহিত্যের সাধারণ ভাষার রূপলাভে সমর্থ হয়নি। (আনিসুজ্জামান, ২০০০ : ৬৫)

রশীদ আল ফারুকীর ভাষায় —

> প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করি তাঁর সাহিত্য-ঐতিহ্যবোধ গোড়া থেকেই গড়ে উঠেছে পুঁথি সাহিত্যকে কেন্দ্র করে — যাকে এখানকার লেখকেরা আজো ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করেন। এ কারণে ভাষায় আরবী-ফারসী ও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে তার মনোভাব অনেকটা ছুৎমার্গগ্রস্ত রোগীর মতো — একেবারেই গোড়া থেকে। অথচ দীর্ঘদিন ধরেও তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। কেউ তাঁর ভাষা গ্রহণ করেননি। (রশিদ, ১৩৮৬ : ৭১)

রাজীব হুমায়ুনের ভাষায় —

> তাঁর গল্পে বা নকশায় দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর প্রস্তাবিত ভাষা ব্যবহৃত হয়নি। তার দু'একটি চরিত্র আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। কোন কোন চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষা তো এমনিতেই আসতে পারে। তবে তাঁর কিছু চরিত্র চলতি বাঙলায় কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ করে আপনাদের তাদের ও আমাদের অর্থে 'আপনেরার' 'তারার' 'আমরার' ইত্যাকার সর্বনাম ব্যবহার করেছে। নিঃসন্দেহে এ সর্বনামগুলো ময়মনসিংহ অঞ্চলের। পূর্ববঙ্গের তথা বাঙলাদেশের ভাষার স্বাতন্ত্র্য সচেতনভাবে নির্মাণ করতে হলে শুধু ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিছু সর্বনাম বা ক্রিয়ার ব্যবহারই যথেষ্ট নয়। (রাজীব, ১৯৮৫ : ৭২)

ভাষা ও রচনারীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নুরুল আমিন বলেছেন —

> ১. ভাষার আঞ্চলিকীকরণ (বিশেষত: পুর্ববাঙলার ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার রূপ গ্রহণ) ২. আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের প্রাচুর্য, ৩. পরিভাষার ক্ষেত্রে সরাসরি ইংরেজি শব্দের আমদানী ৪. আঞ্চলিক ও গ্রামীণ শব্দের প্রাচুর্য ৫. তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের স্বল্পতা ৬. পশ্চিমবাংলার কথ্যরীতির বৈশিষ্ট্য বর্জন, যেমন, ক্রিয়াপদের 'নেই' এর পরিবর্তে 'নাই', 'দিয়ে'র পরিবর্তে 'দিয়া' ইত্যাদির ব্যবহার এবং বিশেষ্য পদে 'তুলো' 'রূপো' ইত্যাদির পরিবর্তে 'তুলা' 'রূপা'র ব্যবহার ৭. একই বাক্যে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের চলতি ও সাধুরূপের সহাবস্থান, যেমন, 'তাহার' না বলে 'তার', 'দেখেছে' না বলে 'দেখিয়াছি'; উদাহরণ: 'হামিদ কি ভুলে তার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছে?' ৮. দেশী ঢঙে ইডিয়ম বা প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার ৯. (আঞ্চলিক) সংলাপধর্মী রচনার প্রতি অধিক ঝোঁক ১০. কখনো কখনো বর্ণনায় নাটকীয় গুণ সৃষ্টি ১১. সহজ ও ছোট বাক্য গঠনের দিকে ঝোঁক ১২. ব্যঙ্গ ও তির্যক উক্তি (সবক্ষেত্রে নয়, হাস্যরস সৃষ্টিতে প্রধান)। (নুরুল, ১৯৮৪ : ১৫৪-১৫৫)

আট

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল যথা — ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালী, বরিশাল, রাজশাহী ও যশোর-কুষ্টিয়ার উপভাষার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। বাংলা সাধুরীতির ভাষা নিয়ে যেখানে কোনো বিতর্ক নাই, সেই সাধুরীতির আদর্শ চলতিরূপই হওয়া উচিত বাংলার মানভাষা এবং হয়েছেও তাই। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া-শান্তিপুর তথা বাংলাদেশের যশোর-কুষ্টিয়ার কথ্যভাষাই সেই আদর্শ চলতি-রীতি এবং এটাই উভয় বাংলার তথা বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ভাষা। এই ভাষাকেই পশ্চিমবঙ্গীয় বা 'কলকাতাইয়া বাংলা' হিসেবে নয়, বরং এদেশের মানুষ ও কবি-সাহিত্যিক তাকে এদেশীয় লেখ্যরীতি হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারাকে আবুল মনসুর

আহমদ পশ্চিমবঙ্গীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করে তার মধ্যে পূর্ববঙ্গের, বিশেষ করে তাঁর এলাকা ময়মনসিংহের মানুষের মুখের ভাষা ও জীবনাচরণকে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছেন। অবশ্য তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, 'পূর্ববঙ্গ' বলতে শুধু একটি জেলা বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলকেই বোঝায় না। এই সীমাবদ্ধতার গণ্ডি তিনি কখনো অতিক্রম করতে পারেননি। তিনি জাতি-সত্তার দিক থেকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ পৃথক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি পূর্ববঙ্গীয় ভদ্রসমাজের কথ্যরীতি হিসেবে যে ভাষাকে আদর্শ ভাষা করার প্রস্তাব করেছেন, তা মূলত ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপভাষা, এবং এই ভাষা কখনো বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না। তবে প্রচলিত আরবি-ফারসি-ইংরেজি শব্দের প্রয়োগের যে প্রস্তাব লেখক করেছেন, তা ক্ষেত্রবিশেষে গ্রহণযোগ্য। তবে সেগুলো কখনোই লেখকের সাহিত্যে প্রয়োগকৃত শব্দের মতো অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য ও অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহারযোগ্য হিসেবে নয়। বাংলা ভাষাকে যেমন দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে, তেমনি মুক্ত করতে হবে অপ্রচলিত আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের প্রয়োগ থেকে। তবেই বাংলা ভাষার প্রবহমানতা ও গতিময়তা বৃদ্ধি পাবে। আর বাংলা সাহিত্যকে তথাকথিত হিন্দুরূপ নয়, মুসলমানি রূপও নয়; একে দিতে হবে বাঙালি রূপ। আর আমাদের বাংলা ভাষা নিজেই সে রূপটি তৈরি করে নিয়েছে।

টীকা

১. "গৌড়েশ্বরগণের সহায়তা না পাইলে বঙ্গভাষা মাথা উঁচু করিয়া সুধী সমাজে দাঁড়াইতে পারিত না। মাথা হেঁট করিয়া পল্লীর এক কোণে চির উপেক্ষিতা হইয়া পড়িয়া থাকিত। এই সকল পুস্তক যে বাঙ্গলা ভাষায় বিরচিত হইতেছিল, ব্রাহ্মণগণ উহা কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাহাদের রচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গলা প্রবাদবাক্য হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যায়। 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিত্রানিচ। ভাষায়াং মানবং শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ' অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ যাহারা বাঙ্গলা ভাষায় শ্রবণ করিবে, তাহারা রৌরব নামক নরকে গমন করিবে।" (দীনেশ, ১৯৭১ : ৯)

২. সে-সময়ে প্রচলিত অবজ্ঞাসূচক একটি বাংলা ছড়ায় এর প্রমাণ পাওয়া যায় —
কৃত্তিবেসে কাশীদেশে আর বামুন-ঘেঁষে
— এ তিন সর্বনেসে।
(উদ্ধৃত : আহমদ শরীফ, ১৯৭৮ : ১৮৭)

৩. যেমন : 'চৈতন্য ভাগবৎ' গ্রন্থে প্রভু চৈতন্যের দরবার বর্ণনায় লেখা হয়েছে — "বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।/বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া ॥/বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।/কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া ॥ এছাড়া এসময়ের একটি সংস্কৃত শ্লোক — 'আশীর্বাদং ন গৃহ্নিয়াৎ পূর্ববঙ্গ নিবাসিনঃ শতায়ুবিতি বক্তব্যে হতায়ুর্বদতি যতঃ।' অর্থাৎ পূর্ব বাঙালির আশীর্বাদ গ্রহণ করিও না। কারণ তারা 'শতায়ু হউক' বলতে গিয়ে 'হতায়ু হউক' বলে ফেলে।" (মনসুর, ১৯৯৫ : ৭৬)

৪. ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড তাঁর *A Grammer of the Bengali Language* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন — "At present those persons are thought to speak the compound idiom (Bengali) with the most elegance who mix up with the pure Indian verbs, the greatest number of Persian and Arabic nouns." Vide, Dr. Dinesh Chandra Sen's The Bangali prose style, P. 6; (উদ্ধৃত : আবু তালিব, ১৯৭৯ : ৩)।

৫. এখানে আবুল মনসুর আহমদ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কিংবা উইলিয়াম কেরীর প্রতি সুবিচার করেননি। রামরাম বসু বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্যশৈলীর কথা তিনি বিবেচনায় আনেননি।

৬. তখনকার মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য হান্টারের (২০০৭) বই থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া হলো —

'আমরা এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি যার ফলে তাদের গোটা সম্প্রদায় (মুসলমান) কর্মহীন হয়ে পড়েছে এবং তারা ভিক্ষাবৃত্তি ও অবমাননাকর জীবন-যাপনের অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে।' (পৃ. ১২৮)

'বৃটিশ শাসনে আর সব ব্যাপারে তারা জাতি হিসেবে ধ্বংস হয়ে গেছে।' (পৃ. ১৩১)

'কোন রাজনীতিবিদ যদি বৃটিশ কমন্স সভায় আলোড়ন সৃষ্টি করতে চান, তাহলে বাংলার যে কোন পুরনো মুসলিম পরিবারের সত্যিকার ইতিহাস বর্ণনা করাই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে।' (পৃ. ১৩৬)

'একশ সত্তর বছর আগে বাংলার কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তানের দরিদ্র হয়ে পড়া ছিল প্রায় অসম্ভর ব্যাপার, কিন্তু বর্তমানে তার পক্ষে ধনী হওয়াটাই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।' (পৃ. ১৩৭)

'বিগত পঁচাত্তর বছরে বাংলার অভিজাত মুসলমান পরিবারগুলো হয় ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা আমাদের শাসনের ফলে সৃষ্ট নতুন সমাজ বিন্যাসের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে।' (পৃ. ১৪৪)

৭. হ্যালহেডের ব্যাকরণটির উন্নতিসাধন করে উইলিয়াম কেরী A Dictionary of the Bengali Language নামে দুটি খণ্ডে প্রকাশ করেন। "প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমালোচক ও ভাষাতত্ত্ববিদ সুশীল কুমার দে লিখেছেন — কেরীর এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, বাংলা ভাষার ভিত্তি ছিল সংস্কৃত। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্য অনুসরণ করেই বাংলা ভাষার বিকাশ লাভ ঘটবে। কেরী নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর বাংলা অভিধানে তিন-চতুর্থাংশ শব্দই ছিল সংস্কৃত শব্দ। সাধারণ মানুষের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দগুলিকে সযত্নে পরিহার করা হয়েছিল। সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও কেরীর এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। সে যুগের শিক্ষিত বাঙালী সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন।" (উদ্ধৃত : সিদ্ধার্থ ও সুরঞ্জন, ২০০৫ : ২৫৩)।

৮. এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি উদ্ধৃতি স্মরণীয় — "আমরা কেন বাংলাব্যাকরণ লিখিতে গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখি, আমাদের কোনো শিক্ষিত লোককেও বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া যায় কেন, এসব কথা ভাবিয়া দেখিলে নিজের উপর ধিক্কার এবং সাহেবের উপর শ্রদ্ধা জন্মে।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৮ক : ১৫)।

"আমরা বাংলাব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃতব্যাকরণ পড়িয়া থাকি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ বাংলার গন্ধ মাত্র থাকে। এরূপ বেনামিতে শিক্ষালাভ ভালো কি মন্দ তাহা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বলিতে সাহস করি না, কিন্তু ইহা যে বেনামি তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কেবল দেখিয়াছি শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ভাষার বাংলা ও সংস্কৃত দুই অংশকেই খাতির দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; ইহাতে তিনি পণ্ডিতসমাজে সুস্থ শরীরে শান্তি রক্ষা করিয়া আছেন কি না সে সংবাদ পাই নাই।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৮ক : ৫৩)।

"তাঁহারা সংস্কৃতবানানকে বাংলাবানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলাবানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন। উহা বাংলা ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। বর্তমান সাহিত্যের বাংলা বহুল পরিমাণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উদভাবিত বলিয়া বাংলাবানান এমনকি বাংলা পদবিন্যাসপ্রণালী তাহার স্বাভাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৮ক : ১০৪)।

৯. "মাতাকে সংস্কৃত ভাষার সমাসসন্ধি-তদ্ধিতপ্রত্যয়ে দেবীবেশে ঝলমল করিতে দেখিলে গর্ব বোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে কাজকর্মের সংসারে আটপৌরে কাপড়ে তাঁহাকে গেহিনি বেশে দেখিতে যদি লজ্জা বোধ করি তবে সেই লজ্জার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিৎ।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৮ক : ৬২)।

১০. বাংলাদেশের কালচার (নামপ্রবন্ধ), (মনসুর, ১৯৯৫ : ৩৬)
সাহিত্যের প্রাণ, রূপ ও আংগিক, (মনসুর, ১৯৯৫ : ৫৪, ৬৪)
ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা, (মনসুর, ১৯৯৫ : ৯১)
১১. পত্রিকাটি বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জি

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৪)। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী।

আজাদ, আবদুর রহিম ও রেজা, শাহ আহমদ (১৯৮৭)। *বাংলাদেশের রাজনীতি : প্রকৃতি ও প্রবণতা, ২১ দফা থেকে ৫ দফা*। ঢাকা : সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র।

আনিসুজ্জামান (২০০০)। *স্বরূপের সন্ধানে*, নির্বাচিত প্রবন্ধ। ঢাকা : অন্যপ্রকাশ।

আনিসুজ্জামান (২০০১)। *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৭৫৭-১৯১৮)। ঢাকা : প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ।

আবু তালিব (১৯৭৯)। *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা; সাধুতা বনাম অসাধুতা*। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বালাদেশ।

আবদুল হাই, মুহম্মদ (১৯৮০), সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। *বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা-প্রীতি*। [সম্পা. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ]। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আবদুল হাই, মুহম্মদ ও আলী আহসান, সৈয়দ (১৯৯৭)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*। ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস।

আবদুর রহিম, খন্দকার (১৯৯৪)। *বাংলাদেশী উপন্যাসের ধারা*। টাঙ্গাইল : খন্দকার প্রকাশনী।

আবুল মনসুর আহমদ (১৯৮৮)। *আত্মকথা*। ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস।

আবুল মনসুর আহমদ (১৯৯৫)। *বাংলাদেশের কালচার*। ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস। আটটি প্রবন্ধ নিয়ে *পাক-বাংলার কালচার* নামে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬ সনে। পরে দুটি প্রবন্ধ সংযোজন করে ১৯৭৪ সনে নাম পরিবর্তন করে *বাংলাদেশের কালচার* নামে দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

আবুল মনসুর আহমদ (১৯৯৮)। *আয়না*। আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী, ১ম খণ্ড [সম্পা. রফিকুল ইসলাম]। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

আহমদ শরীফ (১৯৭৮)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*। ঢাকা : বর্ণমিছিল।

এনামুল হক, মুহম্মদ (১৯৬৮)। *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*। ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স।

এনামুল হক, মুহম্মদ (১৯৯৪)। *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব*, মণীষা মঞ্জুষা, ১ম খণ্ড, মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, ৩য় খণ্ড। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

কাশেম, প্রিন্সিপাল আবুল (১৯৭১)। ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস। *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* [সম্পা. ড. হাসান জামান]। ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ।

দীনেশ চন্দ্র সেন (১৯৭১)। বঙ্গভাষার উপর মুসলমান প্রভাব। *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* [সম্পা. ড. হাসান জামান]। ঢাকা: সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৮০)। সাহিত্য ও সাহিত্যিক। *বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা-প্রীতি* [সম্পা. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ]। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

নীলিমা ইব্রাহিম, (১৯৭৮)। *বঙ্গসংস্কৃতি*। প্রবন্ধ সংগ্রহ [সম্পা. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]। ঢাকা।

নুরুল আমিন (১৯৮৪)। *আবুল মনসুর আহমদের কথাসাহিত্য*। চট্টগ্রাম : অগ্রণী প্রকাশনী।

নূরুর রহমান খান (১৯৯০)। *মুজতবা সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য ও রচনাশৈলী*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৩৯৩)। বাঙ্গালা ভাষা। *বিবিধ প্রবন্ধ*। বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সমগ্র। কলকাতা : তুলিকলম।

বদরুদ্দীন উমর (১৯৭৩)। *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড। কলকাতা : নবজাতক প্রকাশনী।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৬৯)। স্বদেশ ও সাহিত্য। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ (১৯৬৯)। *আধুনিক বাংলা সাহিত্য*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ (১৯৮৫)। *আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক* (১৮৫৭-১৯২০)। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মাহবুব তালুকদার (১৯৮৫)। *সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার : সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মাহফুজউল্লাহ, মোহাম্মদ (১৯৭১)। বাংলা ভাষা ও মুসলিম মানস। *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* [সম্পা. ড. হাসান জামান]। ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ।

প্রমথ চৌধুরী (২০১২)। ভাষার কথা। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। ঢাকা : সুচয়নী পাবলিশার্স।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১শ খণ্ড (১৩৬৮)। *কালান্তর*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড (প্রবন্ধ)। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৬৮ক)। *শব্দতত্ত্ব*। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড (প্রবন্ধ)। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

রশীদ আল ফারুকী (১৩৮৬)। যুগচেতনা, বক্তব্য। ঢাকা।

রাজীব হুমায়ুন (১৯৮৫)। *আবুল মনুসর আহমদের ব্যঙ্গরচনা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (২০০৫)। *আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৭০৭–১৮৫৭)*। কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৩৭৬)। পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সাহিত্য, *আমাদের সাহিত্য*। ঢাকা।

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৮০)। মধ্যযুগের মুসলমান কবি ও বাংলা ভাষা। *বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা-প্রীতি* [সম্পা. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ]। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

হান্টার, ডব্লিউ ডব্লিউ (২০০৭)। *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস* (আনিসুজ্জামান অনূদিত)। ঢাকা : খোসরোজ কিতাবমহল।